দেশের বাইরে দেশ

সূচি

জনসন হাউজ
এরিক এডেলবার্গার
লাজ-শরম
ভিন্ন চোখে
ক্যালটেক
মাউন্ট বল্ডি
টুকিটাকি
জুলফি
ভূমিকম্প
অক্টোবর মাস
সৎ ও অসৎ
খাবার
হার্ব হেনরিকসন
প্রবাসী বাঙালি

জনসন হাউজ

আমেরিকা এসে প্রথম ছয়মাস আমি হোস্টেলে ছিলাম। এখানে অবশ্যি হোস্টেল বলে না, বলে ডর্মিটরী, সংক্ষেপে ডর্ম। ডর্মে থাকার কোনো সমস্যা নেই, একটি ব্যাপার ছাড়া, সেটি হচ্ছে খাবার। বাঙালির ছেলে আজীবন ডাল দিয়ে মেখে দুবেলা ভাত খেয়ে এসেছি, হঠাৎ করে কাঁচা, আধা-কাঁচা, অর্ধসেদ্ধ, মশলাবিহীন আলুনী খাবার পছন্দ করার কোন কারণ নেই। ছয়মাসের মাথায় যখন প্রতি রাতে ঘুমে ধূমায়িত ভাত-মাছের ঝোল এবং কাঁচা মরিচ স্বপ্নে দেখতে শুরু করলাম, বুঝতে অসুবিধে হল না যে আমার ডর্ম ছাড়ার সময় হয়েছে। আইসক্রিম জিনিসটা খেতে খারাপ নয়, কিন্তু একটানা ছয়মাস সকাল, দুপুর এবং রাত তিনবেলা আইসক্রিম খেয়ে পেট ভরানোটা অত্যন্ত করুণ ব্যাপার।

ডর্মিটরী ছেড়ে দিলে নিজের দায়িত্বে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, আমার জন্যে ব্যাপারটা সহজ নয়। ভীতু প্রকৃতির মানুষ, তার উপর নতুন বিদেশে এসেছি। জীবনে ইংরেজি দূরে থাকুক, শুদ্ধ করে বাংলাও বলিনি ("খেয়েছি" না বলে বলে এসেছি "খাইয়া ফালাইছি")। এখন আমাকে যদি চব্বিশ ঘন্টা ইংরেজিতে কথা বলতে হয়, ব্যাপারটা নেহায়েত হৃদয়বিদারক। মনে মনে বাংলা থেকে অনুবাদ করে ঠেলেঠুলে যেটাকে ইংরেজি হিসেবে বের করে দিই, কেউ সহজে সেটা বুঝতে পারে না, একটা কথা চব্বিশ বার করে বলতে হয়। কি জ্বালাতন! আমিও কি তাদের কথা কিছু বুঝি? আকারে, ইঙ্গিতে এবং প্রচুর হ্যাঁ হ্যাঁ করে মাথা নেড়ে কোনো রকমে চালিয়ে এসেছি।

যাই হোক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের থাকার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশপাশে অনেক বাসা রয়েছে। বাসার মালিকেরা বাসাগুলিকে খুপরীতে ভাগ করে একেকটা খুপরী একেকজনকে ভাড়া দেয়। রান্না করার জন্যে বারোয়ারী রান্নাঘর, বাথরুমের জন্যে বারোয়ারী বাথরুম। অনেক খুঁজে খুঁজে সেরকম একটা বাসা পেয়ে গেলাম, নাম জনসন হাউজ। বাসার ম্যানেজার যেরকম লম্বা সেরকম চওড়া, বুকের ছাতি বিয়াল্লিশ ইঞ্চির এক আঙুল কম নয়। ব্যাপারটাকে আরো ভয়াবহ করার জন্যে তার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, চোখ দুটো টকটকে লাল। কথা যখন বলল তখন আমি আবিষ্কার করলাম যে গলার স্বর মধুর মতো। আমাকে এক কথায় একটি রুম দিয়ে হাতে দুটি চাবি ধরিয়ে দিল। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, দুটি চাবি কেন?

একটি রুমের, আরেকটি ফ্রীজের।

ফ্রীজের চাবি ? আমি মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ, ফ্রীজ-টেলিভিশন ছাড়াই বড় হয়েছি। বড়লোক বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় যে দু-চারবার ফ্রীজ দেখেছি, কখনো চাবি দিয়ে খুলতে দেখিনি। একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করেই ফেললাম, ফ্রীজ খুলতে চাবি লাগে?

ম্যানেজার একগাল হেসে বলল, চল রান্নাঘরে দেখাই।

রান্নাঘরে গিয়ে আমার আক্কেল গুড়ুম। চারিদিকে সারি সারি ফ্রীজ রাখা, এবং সেই সব ফ্রীজ শেকল দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাধা। শেকলের মাথার থেকে নানা আকারের তালা ঝুলছে।

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ম্যানেজারের দিকে তাকাতেই সে গম্ভীর গলায় বলল, তালা মেরে না রাখলে খাবার চুরি হয়ে যায়। চোর-ছ্যাচড়ের আড্ডা এখানে। ধাড়ী বদমাশ না হলে কেউ এখানে আসে না মনে হয়।

ম্যানেজার আমার দিকে চোখ ছোট করে তাকাল, আমি তার দৃষ্টির সামনে কেমন জানি কুকড়ে গেলাম।

আমার রুমটি খুব ছোট, ভাড়াও তাই খুব কম, মাসে ষাট ডলার। একটা খাট এবং লেখাপড়ার জন্য একটা করে ছোট চেয়ার-টেবিল কোনোমতে পাতা যায়। ছোট একটা জানালা রয়েছে, সেটা দিয়ে আকাশ দেখা যায়। সিয়াটলের আকাশে অবশ্যি দেখার খুব বেশি কিছু নেই। সারা বছর মেঘে ঢাকা থাকে। ঘরে জিনিসপত্র রেখে বের হতেই দেখি সামনে আরেকটি রুম থেকে একজন মহিলা বের হচ্ছেন, বয়স সম্ভবত চল্লিশের কাছাকাছি। মহিলার পূর্বপুরুষ নিশ্চয়ই জাপান বা অন্য কোনো প্রাচ্য দেশ থেকে এসেছিল, তার ছোট চোখ এবং চাপা নাকে তার ছাপ রয়েছে। ভদ্রমহিলা ঘরে তালা মেরে একটা ব্যান্ডেজ হাতে নিয়ে তালাটার উপরে প্যাচাতে থাকেন। আমি এর আগে কাউকে তালার উপরে ব্যান্ডেজ প্যাচাতে দেখিনি, আবার কখনো দেখব সেরকম আশাও করি না। ভদ্রমহিলা ব্যান্ডেজ প্যাচানো শেষ করে আমার দিকে তাকালেন, ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এ বাসায় থাকবে ?

আমি মাথা নাড়লাম, হ্যাঁ।

তুমি জান না এটা মেয়েদের বাসা ? কোন্ সাহসে তুমি পুরুষমানুষ হয়ে এ বাসায় এসেছ ?

আমি থতমত খেয়ে বললাম, কই ? ম্যানেজার তো সেরকম কিছু বলেনি ?

বলেনি মানে ? এত বড় সাহস ম্যানেজারের, আমি দেখব ম্যানেজারকে। ভদ্রমহিলা পা দাপিয়ে বের হয়ে গেলেন।

অল্প কয়দিনেই আমি বুঝতে পারলাম ভদ্রমহিলার মানসিক ভারসাম্য নেই। সারা রাত তিনি বিড়বিড় করে আপন মনে কথা বলেন, পারতপক্ষে ঘর থেকে বের হন না, যখন বের হন, তা এক মিনিটের জন্যেই হোক আর সারা দিনের জন্যেই হোক, ঘরে তালা মেরেই ক্ষান্ত হতেন না, তালার উপরে এর ব্যান্ডেজ প্যাচিয়ে রাখতেন। ভদ্রমহিলার নাম প্রিসিলা, আমার সাথে শেষের দিকে তাঁর বেশ খাতির হয়েছিল। মানসিক ভারসাম্য নেই বলে তাঁকে সবাই উপেক্ষা করত, যারা উপেক্ষা

করত না তারা দুর্ব্যবহার করত। আমিই শুধু স্বাভাবিক মানুষের মতো ব্যবহার করতাম বলে আমাকে বেশ পছন্দ করতেন। এর অবশ্যি একটু সমস্যা ছিল- প্রায়ই তাঁর রান্না করা খাবার আমাকে খেতে হত, বলতে দ্বিধা নেই, খাওয়া দূরে থাকুক বিদঘুটে সেসব খাবার দেখলেই নাড়ি উল্টে আসত। প্রিসিলা নিজের কথা বলতেন না, একবার শুধু বলেছিলেন যে, তাঁর এক মেয়েকে নাকি গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, আর কখনো তাকে ফিরে পাননি। ঘটনাটি সত্যি, নাকি তাঁর অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা কখনো যাচাই করার সুযোগ পাইনি।

ডর্ম থেকে বের হয়ে জনসন হাউসে উঠেছি ভাত খাবার জন্যে। তাই একদিন হাড়ি-পাতিল কিনে এনে মহা সাড়ম্বরে রান্না শুরু করে দিলাম। এক আমেরিকান পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তারা "ভারতীয় রান্না" নামে একটা ইংরেজি বই দিয়েছে, সেটা দেখে শুরু করেছি। প্রথম দুর্ঘটনা পেঁয়াজ নিয়ে। মাংস রান্না করতে পেঁয়াজ লাগে এবং বইয়ের নির্দেশ মতো সেটা কুচি কুচি করে কাটার কথা। সেটি আমার জীবনের প্রথম পেঁয়াজ কাটা, তখনো জানতাম না পেঁয়াজের ঝাঁঝ নাক দিয়ে ঢুকে চোখ দিয়ে পানি ঝরায়। কেউ যদি পেঁয়াজ কাটার সময় নাক দিয়ে নিশ্বাস না নিয়ে মুখ দিয়ে নেয় তাহলেই কোনো সমস্যা নেই, না কেঁদে যত খুশি পেঁয়াজ কাটা যায়। এতসব জানি না, তাই প্রথমটা কেটে দ্বিতীয়টা শুরু করতে করতে চোখ থেকে নাক থেকে ঝরঝর করে পানি ঝরতে শুরু করেছে। শার্টের হাতায় চোখ মুছতে মুছতে আমি তবুও চাকু চালাতে থাকি। এমন সময় রান্নাঘরে একটি মেয়ে এসে হাজির, মেয়েটি জাপানি, এখন আর নাম মনে নেই। ইংরেজি আমার চেয়েও কম জানে, আমার সাথে বেশ খাতির হয়েছে। সে কাছে এসে আমাকে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বলল, খারাপ খবর পেয়েছ বুঝি?

আমি না বুঝে বললাম, কি বললে ?

খুব খারাপ খবর ? আজকেই পেয়েছ ? আমি খুবই দুঃখিত।

আমার বেশ কিছুক্ষণ লাগে বুঝতে সে কি বলছে। হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম সে আমাকে দেখে ভাবছে আমি মনের দুঃখে কাঁদছি। আমি চোখ মুছে হাসতে হাসতে মেয়েটিকে পেঁয়াজটা দেখিয়ে বললাম, আমি কাঁদছি না, পেঁয়াজ কাটছি।

মেয়েটার খানিকক্ষণ লাগে বুঝতে আমি কি বলছি, বুঝতে পারার পর তার হাসি কে দেখে। হাসি জিনিসটা সংক্রামক, কাজেই আমিও তার সাথে যোগ দিলাম। হাসাহাসি নিশ্চয়ই বেশি হয়ে গিয়েছিল, কারণ হঠাৎ দপ করে চুলোর উপরে রাখা ডেকচির তেলে আগুন ধরে গেল। রান্না করে অভ্যাস নেই, তাই তখনো জানতাম না ডেকচিতে তেল গরম করতে দিয়ে কখনো খোশ গল্প করা যায় না। দেখতে দেখতে দাউ দাউ আগুন, আমি কোনোমতে ঢাকনা চাপা দিয়ে ডেকচিটা চুলো থেকে সরিয়ে আনলাম। আগুন নিভে গেল সাথে সাথে কিন্তু ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার। ক্যাঁ ক্যাঁ করে কর্কশ শব্দে স্মোক এলার্ম বাজতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে ম্যানেজার থেকে শুরু করে জনসন হাউজের সব বাসিন্দা এসে হাজির। কেলেঙ্কারীর এক শেষ। আরেকটু হলে কয়েকটা ফায়ার ব্রিগেড এসে যায় এরকম অবস্থা।

যাই হোক, রান্নার উদ্বোধনীটা একটু বেশি নাটকীয় হয়ে গেলেও রান্নাটা তত বেশি খারাপ হয়নি। রান্নার বইয়ের নির্দেশ চোখ বন্ধ করে মেনে গেলে সব সময়েই রান্না উতরে যায়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হল যে, আমার সেই রান্না আমি বেশি খেতে পারিনি। বইয়ে লেখা ছিল মাংস এক ইঞ্চি টুকরা করে কাটতে, আমিও কেটেছি সেভাবে, দৈর্ঘ এক ইঞ্চি, প্রস্থ এক ইঞ্চি উচ্চতাও এক ইঞ্চি, একেবারে মাপে মাপে। রান্না করার পর সেই চৌকোনা মাংসগুলো ভারি অদ্ভুত দেখাতে থাকে। লুডো খেলার সময় যে ছক্কা ব্যবহার করা হয় অনেকটা সেরকম, তবে আকারে আরেকটু বড়। প্লেটে নেবার পর সে এক আশ্চর্য দৃশ্য, খেতে মন্দ নয় কিন্তু সেই অতিকায় ছক্কা দেখে কেমন জানি খাবার রুচি উঠে যায়। আমার কথা যদি বিশ্বাস না হয় বাসায় যে কেউ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

কিছুদিন মাঝে আবিষ্কার করলাম জনসন হাউজে স্বাভাবিক লোকের সংখ্যা খুব কম (আমি নিজেকে স্বাভাবিক লোকদের দলে ফেলেছি, অনেকের যদিও দ্বিমত রয়েছে)। আমার অবশ্যি সবার সাথে দেখা হয় রান্নাঘরে, সারা দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যস্ত থাকি, সন্ধ্যায় এসে রান্না করে খাই, তারপর আবার লাইব্রেরিতে না হয় ল্যাবরেটরিতে। কে জানে লোকজন হয়ত রান্নাঘরে এলে কম-বেশি অস্বাভাবিক হয়ে যায়। একজন ছিল খুব কম কথার মানুষ, দিনের বেশির ভাগ সময় সে কাটাত রান্নাঘরে, রান্না করতে নয় বাসন ধুতে। তার বাসন ধোয়া একটা দেখার মতো জিনিস, সেটি শিল্পকলায় পৌঁছে গেছে। প্রথমে সে বাসনগুলি সাবান-পানিতে চুবিয়ে রাখত, তারপর সেটি একবার গরম পানিতে ধুয়ে তারপর ঠাণ্ডা পানিতে ধুয়ে নিত। এরপর বাসনগুলি পানি ঝরার জন্যে সাজিয়ে রেখে বসে থাকত। পানি ঝরে গেলে একটা একটা করে বাসন শুকনো তোয়ালে দিয়ে মুছে একটা বাক্সে তুলে রেখে মস্ত একটা তালা ঝুলিয়ে দিত। এই লোকটির নিশ্চয়ই আরো নানা ধরনের সমস্যা আছে। একদিন গভীর রাতে জানলা খুলে দেখি সে গুড়ি মেরে একটা মেয়ের রুমে জানলা দিয়ে উঁকি মারার চেষ্টা করছে। আমাকে জানলা খুলতে দেখে সে কি চোঁ চোঁ দৌড়।

আরেকজন ছেলে ছিল জনসন হাউজে, সেও কম কথার মানুষ। অবসর সময়ে সে হয় ডন বৈঠক করছে না হয় দৌড়াচ্ছে। সে যখন হাটে তার শরীরের মাংসপেশী সাপের মতো কিলবিল করতে থাকে। অতিরিক্ত ব্যায়াম করার জন্যে সে সবসময়েই ঘামে ভেজা। সে যখন রান্নাঘরে থাকত আমি পারতপক্ষে আসতাম না, কারণ সে একসাথে ছয়টা কাঁচা ডিম ভেঙে মুখের মাঝে ফেলে কোৎ করে গিলে ফেলত। বীভৎস দৃশ্য, একবার দেখলে এক সপ্তাহ ভাত খাওয়া যায় না।

জনসন হাউজে আরেকজন ছেলে থাকত। সে এদের দুজনেরই উল্টো। সারাক্ষণই কথা বলছে। সে রান্নাঘরে আসতো কম। যখনই আসতো তখনই দেখতাম সে রান্নাঘরে ওভেন গরম করতে দিয়ে বসে আছে, ওভেনের ভিতরে এলুমিনিয়ামের ফয়েলে গাঁজার পাতা। ঘরে গাঁজার গাছ আছে, যখনই গাঁজা খেতে ইচ্ছা করে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে এনে ওভেনে শুকিয়ে নেয়। খুব নাকি ভালো গাঁজা, এ টানেই পুরোপুরি "স্টোনড" হয়ে যাওয়া যায়। দেশে আমার যেসব বন্ধুরা গাঁজা

খেত (এবং এখনো খায়) তারাও দেখেছি কথা বেশি বলে, এটা গাঁজার একটা গুণ বলা যায়। এই গাঁজাখোর ছেলেটিকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, ঘরে যে গাঁজার চাষ করছ, এটা বেআইনী না?

ছেলেটা বলল, একশবার।

তাহলে পুলিশ যদি খবর পায়?

কীভাবে পাবে?

কেউ যদি বলে দেয়?

ছেলেটা একগাল হেসে বলে, কেউ বলবে না। তুমিও বলে দিও না যেন। খবরদার!

আমি বলিনি, আমার তো জানের মায়া আছে। আমার কথা কিন্তু একবার জনসন হাউজের লোকজন পুলিশকে বলে দিয়েছিল, আমি কিছুই করিনি তবুও। ঘটনাটা খুলে বলতে হয়, এছাড়া বুঝা যাবে না।

আমেরিকা বা বিদেশ সম্পর্কে দেশের মানুষের অনেক মোহ রয়েছে, পুরোটা ঠিক নয়। ছাত্র হয়ে যারা আসে তাদের জীবন ভারি কঠিন। এখানে পড়াশোনা জমিয়ে রাখা যায় না যে একবারে বসে সব শেষ করে দেয়া হবে। প্রত্যেকদিন কাজ করতে হয়, সপ্তাহের সাতদিন, একদিনও ফাঁকি দেবার উপায় নেই। তার উপর পড়াশোনার কায়দা-কানুনও একটু অন্যরকম। বুঝতে একটু সময় লাগে। যেমন ধরা যাক পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারটা, আজীবন জেনে এসেছি বই খুলে পরীক্ষা দেয় শুধুমাত্র গুণ্ডারা, বিশেষ করে যারা সরকারি দলের রাজনীতি করে সেই সব গুণ্ডারা। কাজেই যেদিন ইলেকট্রোডিনামিক্সের প্রফেসর ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন তারা বই খুলে পরীক্ষা দিতে চায়, নাকি বই বন্ধ করে, আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম! যদিও এক অজ্ঞাত কারণে অনেকে বই না দেখে পরীক্ষা দিতে চাইছিল কিন্তু তারা ক্লাশের গণভোটে অল্পের জন্যে হেরে গেল। স্বাভাবিক কারণেই সেদিন থেকে আমি ইলেকট্রোডিনামিকস্ পড়া ছেড়ে দিলাম। যে জিনিস বই দেখে লিখতে হবে সেটা পড়ে সময় নষ্ট করে কি হবে? গল্পে হবুচন্দ্র রাজার গল্প পড়েছিলাম, তার দেশে নাকি মুড়ি-মুড়কির এক দর ছিল, এখানে মনে হয় অবস্থা আরো এক ডিগ্রী সরেস, বই দেখে এবং না দেখে পরীক্ষা দেয়া দুই-ই গ্রহণযোগ্য! যাই হোক, পরীক্ষার দিনে আমি বই ঘাড়ে নিয়ে হাজির হয়েছি, ঘণ্টা পড়তেই প্রশ্ন দেয়া হল। প্রশ্ন খুলে আমার একেবারে আক্কেল গুড়ুম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরীর উপরে দশ দশটা অঙ্ক, বইয়ের সাথে অঙ্কগুলির কোনো সম্পর্ক নেই। পরীক্ষা দিতে গিয়ে আমার একেবারে কালঘাম ছুটে গেল। সেই থেকে আমি সাবধান, এদের আর কিছুতেই বিশ্বাস করি না।

যাই হোক, পড়াশোনার চাপে আমার সবসময়েই দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা। সকালে যাই, সন্ধ্যায় এসে কোনোমতে খেয়ে আবার ফিরে যাই। হয় লাইব্রেরিতে না হয় ল্যাবরেটরিতে, ফিরে আসতে আসতে গভীর রাত। একদিন নয়, দুইদিন নয়, প্রতিদিন।

একদিন মাঝরাতে ফিরে আসছি, নিজের রুমের কাছে এসে আমি থমকে দাঁড়ালাম, দুজন ছেলে আমার ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে। একবার মনে হল ভুল দেখছি, হয়ত অন্য কারো ঘর। ভালো করে তাকিয়ে দেখি কোনো ভুল নেই, সত্যিই সেটি আমার ঘর। আমার চোখের সামনে পাহাড়ের মতন একজন ছেলে ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা মারতে থাকে। পুরনো বাড়ি বলেই কি না জানি না, শক্ত দরজা, অবলীলায় ধাক্কাগুলি সহ্য করে নিল। সঙ্গের ছেলেটা দেখলাম দরজায় কান পেতে কি একটা শোনার চেষ্টা করছে। তারপর মোটা ছেলেটাকে ইঙ্গিত করতেই সে ছুটে এসে আরেক ধাক্কা।

ঠিক এই সময়ে আমি এসে হাজির হলাম, ভূত দেখলে মানুষ যেরকম চমকে উঠে, ছেলে দুটি আমাকে দেখে সেরকম চমকে উঠল। খানিকক্ষণ লাগল তাদের ধাতস্থ হতে, একজন তোতলাতে তোতলাতে বলল, তু-তু-তু-তুমি ?

হ্যাঁ, আমি। কি হয়েছে ?

ছেলে দুটি আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একজন আরেকজনের দিকে তাকাল, আমি দেখতে পেলাম দেখতে দেখতে তাদের চোয়াল ঝুলে যাচ্ছে।

আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে ? আমার ঘরের দরজা ভাঙার চেষ্টা করছিলে কেন ?

মোটা ছেলেটি গলা পরিষ্কার করে ইতস্তত করে বলল, আমরা ভেবেছিলাম তুমি আত্মহত্যা করেছ।

আমার খানিকক্ষণ লাগে তার কথা বুঝতে, কোনোমতে বললাম, আত্মহত্যা করেছি? আমি ?

হ্যাঁ।

কেন ?

ছেলেটা আমার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বলল, তোমার ঘরের ভিতরে একটা কাঁচ ভাঙার শব্দ হল, তাই ভাবলাম-

কি ভাবলে ?

ভাবলাম, তুমি জানলার কাঁচ ভেঙে সেটা দিয়ে হাতের রগ কেটে ফেলেছ।

হাতের রগ কেটে ফেলেছি ? আমি ? বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটে না।

হ্যাঁ। এত অবাক হবার কি আছে, মানুষজন হাতের রগ কেটে আত্মহত্যা করে না বলতে চাও ? সবচেয়ে ভালো উপায় আত্মহত্যা করার। শরীরের সব রক্ত বের হয়ে গিয়ে একটা শান্তিপূর্ণ মৃত্যু।

শান্তিপূর্ণ মৃত্যু ?

হ্যাঁ। অনেকে করে এভাবে-

অন্য ছেলেটি এতক্ষণ চুপ করে কথা শুনছিল। এখন বাধা দিয়ে বলল, পুলিশ এসে পড়বে এক্ষুনি, কি করি ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, পুলিশেও খবর দেয়া হয়ে গেছে ?

মোটা ছেলেটা একটু ক্ষুব্ধ স্বরে বলল, দেয়া হবে না ? মানুষ আত্মহত্যা করলে পুলিশে খবর দেয়া হয় না ?

আমি হাসি চেপে বললাম, এখন ফোন করে বলে দাও, যে আত্মহত্যা করেছিল সে ফিরে এসেছে।

ছেলেটি চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে তার সঙ্গীকে বলল, তুমি ফোন কর, আগেরটা আমি করেছি, এটা তোমাকে করতে হবে।

সঙ্গী মাথা নেড়ে বলল, না, তোমাকে করতে হবে। তোমার বুদ্ধি এটা।

কখনো আমার বুদ্ধি না, তোমার বুদ্ধি।

দু'জনে ঝগড়া লেগে যাবার উপক্রম। কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পুলিশ এসে যেতে পারে, আমাকে যত সহজে ব্যাপারটা বুঝাতে পেরেছে পুলিশকে তত সহজে বুঝাতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজেই ঝগড়া স্থগিত রেখে তারা পুলিশকে ফোন করতে ছুটল, পুরো ব্যাপারটা বুঝাতে তাদের একেবারে কালঘাম ছুটে যাবার অবস্থা।

আমি দরজা খুলে নিজের ঘরে এসে ঢুকি। ঘর পরিষ্কার, কাঁচভাঙা বা কিছুই সেখানে নেই। ছেলে দুটি কোথায় কীসের শব্দ শুনেছিল কে জানে। যাদের কল্পনাশক্তি এত প্রবল তাদের ছোটখাটো শব্দের জন্যে বেশি কষ্ট করতে হয় না, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে শুনে নিতে পারে।

ব্যাপারটি আমাকে একেবারে বিচলিত করেনি বললে ভুল হবে। নিজের চেহারা নিয়ে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না সেটা আমি কখনো দাবি করিনি কিন্তু তাই বলে যেই আমাকে দেখবে সেই ধরে নেবে আমি আত্মহত্যা করার জন্যে ছোক ছোক করে ঘুরে বেড়াচ্ছি ? এটা তো কোনো কাজের কথা হল না। খুব রেগে-মেগে কয়েকদিন ঘুরে বেড়ালাম, সময় পেলেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করতাম চেহারার কোন অংশটা দেখে লোকজন ধরে নেয় আমি সুযোগ পেলেই হাতের রগ কেটে ফেলতে চেষ্টা করি! আমার কোটরাগত চক্ষু ? বদমেজাজী চেহারা ? উশকো-খুশকো চুল ?

এখনো ধরতে পারিনি।

এরিক এডেলবার্গার

এরিক এডেলবার্গার হচ্ছে আমার প্রফেসরের নাম। সে খুব নামী একজন পদার্থবিজ্ঞানী। আমি যখন তার সাথে কাজ করতে যাই তখন জানতাম না যে সে এত নামী ব্যক্তি, তাহলে সাহস করে যেতাম কি না সন্দেহ আছে। আমি ভীরু প্রকৃতির মানুষ- নামী-দামি বিখ্যাত মানুষজন থেকে দূরে দূরে থাকতে ভালবাসি। ঘটনাচক্রে আমি তাকে নিজের প্রফেসর হিসেবে পেয়েছি। ব্যাপারটা এরকম :

আমি যখন প্রথম সিয়াটলে ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াশিংটনে এসেছি তখন ভালো-মন্দ কিছুই জানি না। প্রথম কয়েকমাস কেটে যাবার পর এক সময় লক্ষ্য করলাম আমার ক্লাশের সব ছাত্রই বিভিন্ন প্রফেসরের সাথে কাজ করা শুরু করেছে। তাদের দেখাদেখি আমিও কিছু প্রফেসরের নাম যোগাড় করে খোঁজাখোজি শুরু করে দিলাম। অন্যান্য ছাত্রেরা যখন পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রফেসরদের অবদানের সূক্ষ্ম তারতম্য যাচাই করছিল আমি তখন আমার মোটা বুদ্ধি অনুসারে অগ্রসর হলাম। বুদ্ধিটি মোটা বলে পদ্ধতিটা সহজ। নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে বিবেচনা করে যার নাম আগে আসবে তার কাছে প্রথমে যাওয়া! এডেলবার্গের নামের বানান করা হয় "এ" দিয়ে, কাজেই সে আমার নামের লিস্টে প্রথম।

ফোন নাম্বার বের করে তাকে ফোন করা মাত্রই সে বলল, চলে এস ল্যাবরেটরিতে, কথাবার্তা বলি। খুঁজে খুঁজে নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি বের করতেই সে গুটি গুটি এসে হাজির। আমেরিকানদের তুলনায় সে বেশি লম্বা নয় কিন্তু তার পেটা শরীর। মাথার চুল সামনে দিয়ে পাতলা হয়ে যাচ্ছে, মুখে চাপ দাড়ি। আমার সাথে জোরে জোরে হ্যান্ডশেক করে বলল, আমার নাম এরিক এডেলবার্গার। আমাকে এরিক বলে ডেকো।

শিক্ষকদের আজীবন স্যার বলে ডেকে এসেছি। হঠাৎ করে তাদের একজনকে নাম ধরে ডাকা সহজ ব্যাপার নয়। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হয় কিন্তু জড়তাটুকু কেটে যাবার পর দেখা গেল ব্যাপারটা খারাপ নয়। যাকে নাম ধরে ডাকা হয় স্বাভাবিক নিয়মেই তার সাথে আলগা ভদ্রতা করতে হয় না, কোনো রকম পরিশ্রম ছাড়াই তার সাথে একটা সহজ অন্তরঙ্গতা হয়ে যায়। ইংরেজিতে আবার "আপনি" নেই, সবাই "তুমি", এটাও একটা চমৎকার ব্যাপার। ইংরেজি বা বিদেশী কোনো ভাষারই সূক্ষ্ম মার-প্যাচ বুঝার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু কাকে আপনি বলা উচিত বা কাকে তুমি বলা উচিত, কিংবা তার থেকেও বড় ব্যাপার কাকে এখন আপনি থেকে তুমি-তে নামিয়ে আনা উচিত, এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা করার পুরো কৃতিত্বটুকু ইংরেজি ভাষার প্রাপ্য।

যাই হোক, এরিক আমাকে পুরো ল্যাবরেটরি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়ে তখনি একটি কাজ দিয়ে দিল। কাজটি আমার কাছে মনে হল ভয়ানক জটিল, তার মাথা-মুণ্ডু কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সেদিন আমার আর অন্য কোনো কাজ ছিল না বলে তখন আমি সেটার পেছনে লেগে গেলাম। সেই থেকে আমি তার সাথে আছি, নামের লিস্টে দ্বিতীয় কারো কাছে যেতে হয়নি।

এরিক হচ্ছে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, তার ক্ষুরধার বুদ্ধি এবং সে নিরলস কর্মঠ। এক কথায় তাকে বর্ণনা করতে হলে যে শব্দটি ব্যবাহর করতে হয় সেটি হচ্ছে এনার্জেটিক, দুর্ভাগ্যক্রমে তার ভালো বাংলা প্রতিশব্দ নেই। একটা উদাহরণ দিলে বুঝা যাবে। সে মাঝখানের এক বছরের জন্যে ক্যামব্রিজ এবং হাইডেলবার্গে কাজ করতে গিয়েছিল। সুদীর্ঘ এক বছর তার সাথে কারো দেখা নেই, আমি নিজের স্বার্থে মাঝে মাঝে তাকে চিঠিপত্র লিখে আমাদের এক্সপেরিমেন্টের খবরাখবর পাঠাই। একবছর পর সে ফিরে এল। যেদিন আসার কথা, আমি সকাল সকাল ল্যাবরেটরিতে হাজির হলাম। ঢুকতেই ওয়ার্কশপের ফোরম্যানের সাথে দেখা। সে যদিও ফোরম্যান কিন্তু তার আচার-আচরণ দার্শনিকের মতো, আমাকে দেখেই বলল, তোমার বস এরিক আজ ফিরে এসেছে।

আমি বললাম, জানি।

এক বছর পর সে আজ প্রথম ফিরে এসছে, ফোরম্যান ঘড়ি দেখে বলল, এসে ল্যাবরেটরিতে পা দিয়েছে মাত্র কুড়ি মিনিট আগে।

কি বলতে চাইছে বুঝতে না পেরে আমি তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে গলা নামিয়ে বলল, মানুষটি কুড়ি মিনিটও হয়নি এখানে এসেছে অথচ এই দেখ আমাকে এর মাঝে একটা কাজ দিয়ে দিয়েছে।

আমি দেখলাম তার হাতে একটা কাগজ, সেখানে জটিল যন্ত্রপাতির একটা অংশ টানা হাতে আঁকা, বুঝতে অসুবিধে হল না সেটা এরিকের নিজের হাতের ড্রয়িং।

আমি খুব বেশি অবাক হলাম না, কোনো রকম ভূমিকা ছাড়া সোজাসুজি কাজে নেমে যাওয়া হচ্ছে এরিকের ধাত। ফোরম্যানও অনেকদিন থেকে এরিককে দেখে আসছে তবুও তার বুঝতে কষ্ট হয়, চলে যেতে যেতে ফিসফিস করে বলল, তুমি কীভাবে এই লোকের সাথে কাজ কর ? কাজ করিয়ে সে তো মেরে ফেলবে তোমাদের! এ তো উন্মাদ ব্যক্তি!

বাইরের লোকদের সবারই এরকম ধারণা, সে নাকি তার ছাত্রদের খাটিয়ে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু সেটি সত্যি নয়, খাটিয়ে সে যদি কাউকে মেরে ফেলতে চায় সেটি হচ্ছে তার নিজেকে। কাজেই তার সাথে সাথে যাদের থাকতে হয় চক্ষুলজ্জার খাতিরেই তাদের খাটতে হয়। কিন্তু তার সাথে খেটে আনন্দ আছে, সে প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রত্যেকটি কাজ লক্ষ্য করে। যখনই কিছু একটা ভালোভাবে শেষ হয়, সে ছাত্রটিকে দশবার এসে সে জন্যে প্রশংস করে যায়! অন্য মানুষের প্রশংসা করা একটি অত্যন্ত বড় গুণ, সবাই সেটা পারে না, যারা পারে তাদের সঙ্গ অত্যন্ত সুখকর।

এরিক যুক্তরাষ্ট্রের একটা ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। সে প্রতিভাবান, কর্মঠ এবং বুদ্ধিদীপ্ত- কিন্তু সেটা তো নতুন কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম

প্রফেসরদের তো প্রতিভাবান, কর্মঠ এবং বুদ্ধিদীপ্ত হতেই হবে। মুশকিল হচ্ছে সেটা নিয়ে তো গল্প হয় না। গল্প করতে হলে দরকার ব্যাতিকগ্রস্ত মানুষ, মানুষের দুর্বলতা আর দোষ থেকে বড় গল্প কি হতে পারে? এরিক কিন্তু বাতিকগ্রস্ত মানুষ নয়। তার চরিত্রে কোনো দোষ নেই কিন্তু তবু তাকে নিয়ে গল্প করা যায়।

প্রথমে ধরা যাক তার পোশাকের কথা। সে হচ্ছে একেবারে পুরোদস্তুর ঝানু প্রফেসর, আমেরিকার সবচেয়ে নামকরা প্রফেসরদের একজন কিন্তু সে নাকি জীবনে স্যুট-টাই পরেনি। সে নিজে একদিন গর্ব করে বলেছে, প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে থাকাকালীন কি একটা ব্যাপারে সব প্রফেসরদের নিয়ে যখন ছবি তোলা হচ্ছিল সবাই স্যুট-টাই পরে এসেছে, সে ছাড়া। তার পরনে ছিল ভুসভুসে প্যান্ট এবং ভুসভুসে শার্ট! সেই প্যান্টের রঙ যদি হয় গোলাপী এবং শার্টের রঙ হয় বেগুনী, আমি অবাক হব না। বেচারা এরিকের বর্ণজ্ঞান নেই (কালার ব্লাইন্ড), কাজেই সে মাঝে মাঝেই আশ্চর্য রঙের কাপড় পরে চলে আসত। আমি নিজে তাকে সবুজ মোজা এবং গোলাপী জুতা পরতে দেখেছি।

পোশাক নিয়ে মাথা না ঘামানো অবশ্যি আমেরিকার ছাত্র বা প্রফেসরদের জন্যে মোটেও অস্বাভাবিক নয়। এরিক সেদিক দিয়ে এমন কিছু ব্যতিক্রম নয় কিন্তু সে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে পছন্দ করত। যেমন ধরা যাক, নিউক্লিয়ার ফিনিক্স ল্যাবরেটরির বাৎসরিক ফটো তোলার ব্যাপারটি। প্রত্যেক বৎসর এই ল্যাবরেটরির যে রিপোর্ট বের হয় সেই রিপোর্টে এই ছবিটি থাকে। রিপোর্টটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। ল্যাবরেটরির বাজেট-এর উপর নির্ভর করে তাই অনেক খেটে-খুটে এটা তৈরি করা হয়। প্রত্যেক বৎসর এই ছবি তোলার সময় দেখা যায় এরিক সাদা ফোমের তৈরি দুটি গোল গোল চাকতি তার চোখে লাগিয়ে নিয়েছে, ফলস্বরূপ তাকে দেখাতো ভয়াবহ, মনে হত বড় বড় চোখ কিন্তু সে চোখে কোনো মণি নেই, একটা বীভৎস প্রাণীর মতো। পর পর দুই বৎসর তার এক ছাত্র ব্যাপারটি কোনোমতে সহ্য করল, তৃতীয় বৎসর সে তাকে শাসাতে শুরু করে, দেখ এরিক, তুমি যদি আবার চোখে ওসব লাগাও ভালো হবে না কিন্তু। আমি মা-বাবাকে ছবিটা দেখাতে পর্যন্ত পারি না লজ্জায়, বলবে কোথাকার কোন্ পাগল-

এরিক তার ছাত্রের কথা গায়ে মাখল না, পরের বৎসর ছবি তোলার সময় দুই চোখে সাদা সাদা চাকতি লাগিয়ে নিয়ে আবার এক ভয়াবহ প্রাণী সেজে গেল!

এরিক গতানুগতিক নিয়ম-কানুনে বিশ্বাস করত না। যেমন ধরা যাক অফিসের ব্যাপারটা। যারা প্রফেসর তাদের জন্যে আলাদা আলাদা সুন্দর অফিস, এরিক ছাড়া। তার অফিসে সে সমস্ত নিয়ম-কানুন ভেঙে একজন ইনজিনিয়ারকে রেখেছে, ইনজিনিয়ার ভদ্রলোক একসময় তার ছাত্র ছিল সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। তাদের ডেস্ক দুটি একটি দেখার মতো দৃশ্য ছিল, এত অল্প জায়গায় যে এত জঞ্জাল জমা হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দুজনের একজনও তাদের টেবিলে কাজ করতে পারত না, কিছু লেখার প্রয়োজন হলে কোলের উপর খাতাপত্র রেখে লিখতে হত। তাদের ডেস্ক দুটি এত বেশি জঞ্জালে ভরা ছিল যে দূর দূর থেকে মানুষ সেটা দেখতে আসত, আমি নিজে দুই দলকে দেখিয়েছিলাম। যাই হোক, ব্যাপারটি

আরো গুরুতর করার জন্যে এরিক একদিন আমাকে ধরে বলল, তুমি আমার অফিসে চলে এসো, একটা খালি টেবিল আছে।

আমার চমৎকার নিরিবিলি রুম আছে, অন্য ছাত্রদের সাথে সেখানে বসে আমি আড্ডা মারি। আমি কোন্ দুঃখে আমার প্রফেসরের সাথে এক রুমে বসতে চাইব? আমেরিকান ছাত্র হলে সোজা মুখের উপর না করে দিত, আমি বাঙালি মানুষ, অনুরোধে ঢেকি তো ছোট জিনিস, জাহাজ পর্যন্ত গিলে ফেলি। কাজেই এরিকের অনুরোধে তার পাশের টেবিলে গিয়ে বসতে হল। ছাত্র এবং প্রফেসর এক ঘরে বসা ল্যাবরেটরির ইতিহাসে মনে হয় সেই প্রথম এবং সেই শেষ! লাভের মাঝে লাভ হল, আমি অফিস ব্যবহার করা ছেড়ে দিলাম, কাজকর্ম যা করার সব ল্যাবরেটরিতে।

আমাদের দেশে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কথা বললেই চোখের সামনে ঢিলেঢালা একজন ব্যক্তির ছবি ভেসে উঠে। ঠিক কি কারণ জানি না কিন্তু মিলিটারী অফিসার ছাড়া অন্য কারো ভালো স্বাস্থ্য আমরা কল্পনা করতে পারি না। কবি বললেই রুগ্ন একজন মানুষের চেহারা ভেসে উঠে, সাহিত্যিক মাত্রই এলোমেলো চুল এবং বিজ্ঞানীদের ভারি চশমা। এখানে ব্যাপারটা সে রকম না, কবি-সাহিত্যিক আর বিজ্ঞানী সবারই চমৎকার স্বাস্থ্য! এরিক এতবড় বিজ্ঞানী কিন্তু তার শরীরও পাথরের মতন। ল্যাবের অন্য দশজন ছাত্র এবং প্রফেসরের মতো সে সাইকেল চালিয়ে ল্যাবরেটরিতে আসে। সাইকেলের তার ভারি শখ, একটা সাইকেল কিনেছে তিনহাজার ডলার দিয়ে, (আমি অনেক খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেও অবশ্যি আমার সত্তর ডলারের সাইকেলের সাথে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাইনি!) এরিক প্রত্যেকদিন তার তিনহাজার ডলারের সাইকেলে করে প্রায় একটা খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠে আসে। সময় পেলেই সে পাহাড়ে চলে যায়, পাহাড়ে ওঠার তার ভারি শখ। যখন পাহাড় থেকে ফিরে আসত, বুঝতে কোনো অসুবিধে হত না, রোদে পুড়ে একেবারে টমেটোর মতো হয়ে যেত। সাঁতারেও তার খুব উৎসাহ, তার সাথে আমি ভূমধ্যসাগরে সাঁতার কেটেছিলাম। খাটি বাঙালির ছেলেরা খাল-বিল-পুকুরে মানুষ হয় বলে সাধারণত চমৎকার সাঁতার জানে, সে হিসেবে আমার দীর্ঘ সময় সাঁতার কাটতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের পানিকে উষ্ণ পানি হিসেবে ধরা হলেও আমাদের জন্যে সেটি বেশ ঠাণ্ডা, তাই বেশিক্ষণ একটানা থাকতে পারতাম না। একটু পরে পরে উঠে এসে রোদে শুয়ে শরীর গরম করে নিতে হত।

ভূমধ্যসাগরে আমরা ঠিক বেড়াতে যাইনি, সেখানে কর্সিকা নামে একটি দ্বীপে আমাদের একটি কনফারেন্স ছিল। (কর্সিকা হচ্ছে নেপোলিওনের জন্মস্থান)। সমুদ্রতীরে চমৎকার একটা কনফারেন্স হল। দুপুরে দুই ঘন্টার অবসর, এরিক আমাকে বলল, চল, সাঁতার কেটে আসি। তার সাথে সমুদ্রতীরে এসে আমার আক্কেল গুড়ুম। শত শত নারী-পুরুষ বালুতে শুয়ে-বসে আছে, পানিতে সাতার কাটছে, কারো শরীরে একটা সূতা পর্যন্ত নেই। কনফারেন্সে কমবয়স্কা সুন্দরী সেক্রেটারী মেয়েটি যে একটু আগে আমাকে ফর্ম ফিল আপ করতে সাহায্য করেছে সে এখন একেবারে ন্যাংটা অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

অবস্থা দেখে ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এই ধরনের এলাকার কথা আগে শুনেছি, স্বচক্ষে দেখিনি। শিবরাম চক্রবর্তীর একটা গল্প পড়েছিলাম, সেখানে লেখা ছিল, যারা এই সব এলাকায় আসে তাদের নাকি কাপড় খুলে ফেলতে হয়। এখন কি আমাকে কাপড় খুলে ফেলতে হবে ? কী সর্বনাশা ব্যাপার! তোতলাতে তোতলাতে বললাম, এরিক, আমরা কোথায় এসেছি ? এটা কী ন্যুডিস্ট কলোনী ? কী সর্বনাশ! আমার কী কাপড় খুলতে হবে ?

এরিক বলল, ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ইউরোপের লোকজন এসব ব্যাপারে খুব উদার, অল্পতেই কাপড় খুলে ফেলে। তোমার ইচ্ছা না হলে খুলবে না।

আমার কপাল ভালো, এরিকও তার কাপড় খোলার চেষ্টা করল না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, আমার অন্য এক প্রফেসর কোনোকিছু পরোয়া না করে সব কাপড়-জামা খুলে রোদে পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। আমি তাকে পাশ কাটিয়ে এরিকের সাথে ভূমধ্যসাগরে নেমে পড়লাম সাঁতার কাটতে।

সারা দুপুর সাঁতার কেটে বিকেলের অধিবেশনে আবার সবাই এসে হাজির। সবাই আবার কাপড়-জামা পরে এসেছে, এরিক ছাড়া। তার পরনে সাঁতারের সেই ছোট সুইমিং ট্রাংক ছাড় আর কিছু নেই। ঢোকার আগে অধিবেশনের প্রেসিডেন্টের অনুমতি নিয়ে নিল, খালি পা এবং খালি গা থাকলে অনেক রেস্টুরেন্টে ঢুকতে দেয় না, সেই জন্যে এই সাবধানতা।

কনফারেন্সে এরিক হচ্ছে একেবারে আগুনের হলকা। জটিল বৈজ্ঞানিক জিনিসপত্র সে এত তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে যে সেটি প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কেউ যে গুলপট্টি মেরে কনফারেন্স থেকে বের হয়ে যাবে সেটি হবার উপায় নেই। সে এমনিতে প্রচণ্ড ভদ্রলোক কিন্তু কেউ যদি ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে তাকে প্রায় আক্ষরিক অর্থে সে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। আমার এক সহকর্মী এক কনফারেন্সে তাকে প্রথমবার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল, চোখ কপালে তুলে বলল, তুমি এই সিংহের সাথে কাজ করেছ ? তোমার সাহস তো কম নয়।

আমি মুখে একটা স্মিত হাসি ফুটিয়ে তার বিস্ময়টুকু উপভোগ করলাম, সত্যি কথাটি বলে তার ভুল ভেঙে দেবার চেষ্টা করলাম না। প্রয়োজনে সে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে সত্যি কিন্তু ছাত্রদের সাথে সে একেবারে অন্যরকম। কোনো কিছু বুঝাতে সে যে শুধু প্রচণ্ড ধৈর্যের পরিচয় দেয় তাই নয়, সেমিনার-কনফারেন্সে সে ছাত্রদের সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থেকে আগলে রাখে, কার সাহস আছে তার ছাত্রকে এসে উৎপাত করে!

কর্সিকার কনফারেন্সের সূত্রে আরো একটা কথা বলা যায়। কনফারেন্স শেষে আমরা সবাই একটা চার্টার্ড প্লেনে করে প্যারিস এসে পৌঁছেছি। আমি তখন ছাত্র মানুষ, নিজের খরচে প্যারিসের মতো জায়গায় হোটেলে থাকার ক্ষমতা নেই, তাই আগে থেকে প্যারিসে প্রবাসী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে এসেছি। প্লেন থেকে নেমেই দেখতে পেলাম, বন্ধু সপত্নী আমাকে নিতে এসেছে এয়ারপোর্টে। এরিকের সাথে ভদ্রতা করে পরিচয় করিয়ে দিলাম, সে বেশ অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার, যেখানেই যাই সেখানে দেখি তোমার বন্ধু রয়েছে ? নিউইয়র্কে তোমার বন্ধু, লন্ডনে

তোমার বন্ধু, এখন প্যারিসেও দেখছি তোমার বন্ধু। তোমার তো কোথাও থাকার কোনো সমস্যা নেই।

আমি উত্তরে কিছু না বলে হে হে জাতীয় একটা শব্দ করলাম, এরকম অবস্থায় যা করা দস্তুর। আমার থাকার জায়গার সমস্যা নেই বলার পেছনে এরিকের একটা কারণ ছিল। সে যখন প্যারিসে নেমেছে কোনো হোটেলে থাকার জায়গা পায়নি। গ্রীষ্মকালে সব হোটেল ভর্তি হয়ে যায়, আগে থেকে ব্যবস্থা না করে রাখলে ভারি অসুবিধে। কর্সিকা যাবার প্লেন পরের দিন, তাই কোথাও রাত কাটাতে হবে। এরিক এবং তার এক সহকর্মী কোথাও জায়গা না পেয়ে ঠিক করল, এক পার্কে স্লীপিং ব্যাগ বিছিয়ে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেবে। পার্কে রাতে থাকা বেআইনী ব্যাপার, তাই মাঝরাতে যখন পুলিশ এসে হামলা করল তারা বিছানাপত্তর গুটিয়ে দে দৌড়। বয়স্ক বয়স্ক দুজন ঝানু প্রফেসর বোচকা-বুচকি নিয়ে দেয়াল টপকে কোনোমতে পালিয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটি কল্পনা করা আমার পক্ষে এখনো কষ্টকর।

বিদেশে সব জায়গায় আমার বন্ধু-বান্ধব ছড়িয়ে রয়েছে ব্যাপারটি এরিককে সত্যিই খুব অবাক করেছিল। আমি যখন আমার পি.এইচ.ডি. পরীক্ষার সেমিনারটি দিতে যাই, সে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বলেই ফেলল, আমি পৃথিবীর অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছি, যেখানেই বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রী দেখেছি জাফরের কথা জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা শুনলে অবাক হবে যে, সবাই তাকে চিনেছে।

আমি মুখে একটা বিনয়ের দেঁতো হাসি ফুটিয়ে বসে রইলাম। সত্যি কথাটি দেশের জন্যে এত লজ্জাজনক যে বলে আর ভুল ভাঙাতে ইচ্ছে করল না। এরিক ভুল বলেনি, সত্যি সত্যি বাংলাদেশের সমসাময়িক পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা আমাকে চিনে। যে জিনিসটা সে জানে না সেটা হচ্ছে আমিও তাদের সবাইকে চিনি, কারণ আমরা সবাই একে অপরের বন্ধু-বান্ধব বা পরিচিত। দেশে দশ কোটি মানুষ সত্যি কিন্তু স্কুল-কলেজ শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আসতে আসতে সংখ্যা এত কমে যায় যে, একে অপরকে চেনা আর কঠিন কিছু নয়। শুধু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা একে অপরকে চিনে তাই নয়, বাংলাদেশে যারা সবরকম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, শিক্ষা-সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখে তারাও সবাই সবাইকে চিনে! দেশের কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইনজিনিয়ার এক কথায় উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা সবাই মিলে একটি ক্ষুদ্র শ্রেণী, বাংলাদেশের দশকোটি মানুষের সেখানে স্থান নেই। এই স্বল্প সংখ্যক মানুষ দেশকে উপভোগ করে, আবার তাদের সন্তানেরা বড় হয়ে এই দেশকে উপভোগ করবে, অন্যেরা রয়েছে শুধুমাত্র কোনোভাবে বেঁচে থাকার জন্যে। ব্যাপারটি আমাদের জন্যে গৌরবের নয়, এরিককে তা-ই মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

যাই হোক, এরিকের একটা ছোট গল্প বলে শেষ করি। আগেই বলেছি তার বর্ণজ্ঞান নেই, সে হচ্ছে কালার ব্লাইন্ড, তাই সে লাল রঙটি দেখতে পায় না। মানুষের কোনো ধরনের অক্ষমতা থাকলে তারা চেষ্টা করে সেটা লুকিয়ে রাখতে। এরিকের বেলায় ব্যাপারটি একেবারে উল্টো, সে প্রথম সুযোগে সবাইকে জানিয়ে দেয় যে সে কালার ব্লাইন্ড। ল্যাবরেটরির নানা ধরনের যন্ত্রপাতি কোনো কালার

ব্লাইড-এর উপযুক্ত রঙ দিয়ে রাখা হয় না (সেটি হচ্ছে হলুদ), সেটা নিয়ে সে প্রায়ই চেঁচামেচি করত। প্রায় সময়েই সে আমার কাছে রেজিস্টার নিয়ে আসত উপরের রঙগুলি বলে দেবার জন্যে, রেজিস্টারের পরিমাণ রঙ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, যেটা সে দেখতে পায় না। একদিন ল্যাবরেটরিতে কাজ করছি, সে আমার কাছে এসে হাজির, তাকে দেখে আমি আঁতকে উঠলাম। হাত রক্তে মাখামাখি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দেখেছ, এটা রক্ত। কখন হাত কেটে গেছে টের পাইনি, আমি ভাবছি বুঝি গ্রীজ লেগেছে। থেমে গিয়ে হঠাৎ ভুরু কুঁচকে বলল, এটা তো রক্ত, ঠিক না?

আমি আর কি বলব?

লাজ-শরম

প্রথমবার আমেরিকা আসার আগে আমার বন্ধুরা নানারকম সদুপদেশ দিয়ে আমাকে প্রবাস জীবনের জন্যে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছিল। সবাই যে বিদেশে গিয়েছিল তা নয় কিন্তু সে জন্যে উপদেশ দিতে তাদের কোনো অসুবিধে হয় নি (আমারও হয় না, কিছুদিন আগে মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন করতে হলে কি করা উচিত সে সম্পর্কে একজনকে উপদেশ দিয়েছি)। বন্ধুদের সদুপদেশগলি ব্যাপক, একটু উদাহরণ দেয়া যাক :

এক : খবরদার, লুঙ্গি পরে ঘর থেকে বের হবি না, ওরা লুঙ্গিকে মনে করে স্কার্ট, পুরুষ মানুষের স্কার্ট পরা খুব লজ্জার ব্যাপার।

দুই : যেখানে সেখানে ফেৎ করে নাক ঝেড়ে বসবি না, পুলিশ ধরে নিয়ে যাবে।

তিন : পকেটে ঢাউস মার্কা রুমাল নিয়ে ঘুরে বেড়াবি না, ওদেশে রুমাল হচ্ছে কাগজের, নাক জেড়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে হয়, পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

চার : খাবারের পর ঢেকুর তুলবি না, যতই ভালো লাগুক খাবার, খবরদার, ঢেকুর তুলবি না।

পাঁচ : মাথায় গামলা গামলা তেল দিবি না, বিদেশে কেউ মাথায় তেল দেয় না।

ছয় : ডান হাতে চাকু বাম হাতে কাটা চামুচ, খবরদার, যেন ভুল না হয়।

সাত : কিছু যদি খেতে না পারিস হ্যামবার্গার খাবি, যদিও হ্যাম বলে কিন্তু আসলে হচ্ছে গরুর কিমা। ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দেখাই যাচ্ছে এমন কোনো বিষয় নেই যেটি সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দেয়া হয়নি। যারা বিদেশে ছিল তারা পর্যন্ত চিঠি লিখে উপদেশ দিয়েছে। আমি তাই ভেবেছিলাম বুঝি বিদেশ সম্পর্কে সবকিছুই জানা হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল সেটি সত্যি নয়। একটি জিনিস কেউ আমাকে বলেনি, কেন বলেনি সেটি এখনো আমার কাছে রহস্য। এত গুরুতর একটা জিনিস মানুষ কেমন করে চেপে যায় কে জানে! ব্যাপারটা খুলে বলি।

প্রথম এসে আমি ডর্মিটরীতে উঠেছি, ডর্মিটরীতে ছেলে এবং মেয়েরা পাশাপাশি থাকে, কাজেই খুব ভয়ে ভয়ে বাথরুমে গেলাম। ছেলে এবং মেয়েদের বাথরুম আলাদা, ভুলে মেয়েদের বাথরুমে ঢুকে মার টার খেয়ে গেলে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে। বারোয়ারী বাথরুম, সারি সারি বেসিন, একপাশে গোসলের জায়গা, অন্যপাশে

টয়লেট : আমি দাঁত মাজার জন্য টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়েছি এমন সময় আরেকজন লোক এসে ঢুকল, হাতে তোয়ালে-সাবান, তাই ভাবলাম হয়ত গোসল করবে। লোকটি ভিতরে ঢুকে প্রথমে শার্ট খুলে ফেলল, তারপর গেঞ্জী। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখি লোকটি কোনোরকম দ্বিধা না করে তার প্যান্টটা খুলে দিব্যি আন্ডারওয়ার পরে দাঁড়িয়ে রইল। এখানকার লোকজনের লজ্জা-শরম একটু কম বলে শুনেছিলাম, এবারে চাক্ষুস দেখে বিশ্বাস হল। আমি দাঁত মাজতে মাজতে আয়না দিয়ে আড়চোখে এই বেয়াড়া লোকটির কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিলাম, হঠাৎ কথা নেই বার্তা নেই, লোকটি তার আন্ডারওয়ার খুলে পরিষ্কার দিগম্বর হয়ে গেল।

এক মুহূর্তে আমি বুঝে গেলাম ডর্মিটরীতে কীভাবে কীভাবে জানি একটা পাগল এসে ঢুকে গেছে। ছেলেবেলায় নূরা পাগলা নামে একজন বদ্ধ উন্মাদ ব্যক্তিকে চিনতাম, সেও লোকজনের সামনে তার লুঙ্গি খুলে ফেলত। নূরা পাগল খ্যাপা গোছের ব্যক্তি ছিল এবং তাকে দেখলেই আমরা ছেলেপিলেরা প্রাণ নিয়ে ছুটতাম। এবারেও আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া জান নিয়ে পালানো কিন্তু ঠিক তখনি আরেকজন লোক এসে ঢুকল, আমি একটু সাহস ফিরে পেলাম। দুজন মানুষের সামনে একজন পাগল কি আর করতে পারে, বিশেষ করে দেখতে যখন তাকে বেশ নিরীহ গোছেরই মনে হচ্ছে। দ্বিতীয় লোকটি এই উন্মাদ ব্যক্তিটিকে দেখে যতটুকু চমকে উঠবে ভেবেছিলাম, মনে হল সেরকম চমকাল না। একটু অবাক হয়ে দেখলাম, লোকটা স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে শুরু করল। আমি আড়চোখে দুজনকে লক্ষ্য করছি, হঠাৎ দেখি দ্বিতীয় লোকটিও তার জামা-কাপড় খুলতে শুরু করেছে এবং দেখতে দেখতে সেও পুরো দিগম্বর! দুইজন পূর্ণবয়স্ক নগ্ন ব্যক্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে খোশ গল্প করছে দৃশ্যটি আমার জন্যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার এবং সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্যটি দেখে আমি হঠাৎ করে বুঝতে পারলাম, এদেশে বাথরুমে একজন আরেকজনের সামনে ন্যাংটা হতে দ্বিধা করে না।

এরপরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে, বাথরুমে, লকার রুমে আজকাল আর দিগম্বর ব্যক্তি দেখে চমকে উঠে পালাতে চেষ্টা করি না, কিন্তু এর বেশি খুব একটা উন্নতি হয়নি, দিগম্বর ব্যক্তি দেখলে এখনো আমার নূরা পাগলার কথা মনে পড়ে। দেশে যে জিনিসটা করার জন্যে একজন মানুষকে তার স্বাভাবিকভাবে চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হতে হয়, সেটাই এখানকার লোকজন কত সহজে করে ফেলে। মনে আছে, আমি ঢাকায় যখন ফজলুল হক হল-এ থাকতাম, আমাদের সাথে একজন গুণ্ডা ধরনের ছেলে পড়ত। সরকারি দলের রাজনীতি, প্রয়োজনে হকিস্টিক এবং রিভলবার নিয়ে লাফ-ঝাঁপ দেয়া, ইলেকশানের সময় ব্যালট বাক্স ডাকাতি ইত্যাদি কাজে সে বিশেষ পোক্ত ছিল। গুণ্ডা ধরনের ছেলেদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তার লজ্জা-শরম কম, মুখের লাগাম নেই, অবলীলায় কুৎসিত কথাবার্তা বলে ফেলে। সেই ছেলে একদিন বাথরুমে গোসল করতে গিয়ে লুঙ্গি-তোয়ালে রেখেছে দরজার উপরে। তার এক বন্ধু (সেও গুণ্ডা) রসিকতা করার জন্যে সেই লুঙ্গি আর তোয়ালে টেনে নিয়ে চলে গেল, এর পরের ঘটনা অবিস্মরণীয়। সেই দুর্ধর্ষ গুণ্ডা প্রথমে দু-চারটি হাঁক দিয়ে সে কী করুণ স্বরে কাকুতি-মিনতি। কিছুতেই

সে বাথরুম থেকে বের হতে পারে না, ঘন্টার পর ঘন্টা ভিতরে আটকা পড়ে রইল। সে যত বড় বেহায়া ব্যক্তিই হোক না কেন কাপড়-জামা ছাড়া বের হয়ে আসার কথা একবার চিন্তাও করতে পারে না। অথচ এ দেশে একজন যে কত সহজে আরেকজনের সামনে নগ্ন হয়ে যায় সেটা আমাদের জন্যে কল্পনা করাও কঠিন।

একবার যদি ধরে নেয়া যায় যে পুরুষ পুরুষের সামনে ন্যাংটা হতে পারে (এবং সে কারণে মেয়েরা মেয়েদের সামনে), তাহলে কিছু কিছু জিনিস অনেক সহজ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক বাথরুমের কথা, সেখানে আর পার্টিশনের প্রয়োজন নেই, ছোট একটা বাথরুমে একসাথে অনেক মানুষকে আটানো সম্ভব। স্টেডিয়ামে একবার দেখেছিলাম এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য। স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে আসে প্রায় হাজার হাজার লোক, বিরতির সময় প্রায় সবাই বাথরুমে যায়। একসাথে এত মানুষ বাথরুমে হাজির হলে তাদের সামলানো খুব সহজ ব্যাপার নয়, কাজেই সেখানে মস্তবড় বড় গামলা বসানো আছে। সবাই গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে সেই গামলার মাঝে পেশাব করে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না যে, বয়স্ক মানুষেরা গম্ভীর হয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে একটি গামলার মাঝে কাটাকাটি খেলার মতো পেশাব করছে।

এর থেকেও ভয়ঙ্কর ব্যাপার আছে, সেটি হচ্ছে দরজাবিহীন লেট্রিন। পৃথিবীর সব মানুষেরই এসব জায়গায় যেতে হয়, লোকচক্ষুর আড়ালে কাজকর্ম সেরে আসতে হয়, কিন্তু দরজা না থাকলে মানুষ লোকচক্ষুর আড়ালে কাজকর্ম সারবে কেমন করে? একজন সুস্থ মস্তিষ্কের পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি চুপচাপ বসে তার কাজ সারার চেষ্টা করছে, সেটি একটি অত্যন্ত করুণ দৃশ্য। যে জিনিসটি সবচেয়ে হৃদয়বিদারক সেটি হচ্ছে তখন প্রাণপণ চেষ্টা করে মুখে একটা গাম্ভীর্য বজায় রাখতে, কিন্তু সে কি সহজ? পৃথিবীর কোনো মানুষ ওরকম জায়গায় তার মান-সম্মান বজায় রেখে বসে থাকতে পারে? তবে সৌভাগ্যের ব্যাপার, দরজাবিহীন লেট্রিনের সংখ্যা খুবই কম, লোকালয়ের বাইরে পার্ক বা অল্প ব্যবহৃত বাস স্টেশনে এ ধরনের জায়গা কখনো কখনো দেখা যায়। যত বড় বেহায়া মানুষই হোক, দরজাবিহীন লেট্রিনে তো আর কেউ শখ করে যেতে পারে না!

বাথরুমে, লকার রুমে ন্যাংটা মানুষ দেখে আমি আরো একটা নতুন জিনিস শিখেছি। সেটি হচ্ছে যে, যদিও "খৎনা" নামক ব্যাপারটি শুধুমাত্র মুসলমান এবং ইহুদীদের ধর্মীয় ব্যাপার কিন্তু আমেরিকার প্রায় সব পুরুষমানুষ এটি প্রায় রুটিন মতো করে থাকে স্বাস্থ্যগত কারণে। সাধারণত বাচ্চা জন্মানোর চব্বিশ ঘন্টার মাঝে এটি করে ফেলা হয়। আমার এক আমেরিকান বন্ধুর একটি বছর তিনেকের ছেলে আছে, একদিন কি এক কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সে তার ছেলের খৎনা করিয়েছে কি না। বন্ধুটি জানাল তার বিশেষ ইচ্ছে ছিল না, তবু করানো হয়েছে।

আমি বললাম, ইচ্ছে ছিল না কেন?

প্রকৃতি পশুপাখি এবং মানুষকে নিখুঁতভাবে তৈরি করেছে, সেটার উপর কেরদানী করার কিছু দরকার নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটি করা হয় স্বাস্থ্যগত কারণে, একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলেই আর এর প্রয়োজন হয় না।

তাহলে তুমি তোমার ছেলের "সারকুমসিশান" করালে কেন ?

আমাকে করানো হয়েছিল তাই আমার স্ত্রী জোর করল। সে চায় না যে আমার ছেলে বড় হয়ে দেখুক যে আমার "ইয়েটি" একরকম আর তারটি অন্যরকম।

আমি আর কথা বাড়ালাম না, কোন্ মুখে বাড়াই! "ইয়ে" দূরে থাকুক আমরা আমাদের বাবাদের সামনে কখনো হাঁটুর উপরে কাপড় তুলতে দেখেছি কি না মনে করতে পারি না।

লজ্জা-শরম ব্যাপারটি একটু জটিল, কোন্টাতে লজ্জা পেতে হয় এবং কোন্টাতে পেতে হয় না সেটা পুরোপুরি সহজাত নয়, খানিকটা অভ্যাসের ব্যাপার আছে। যেমন ধরা যাক এখানকার টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, এগুলির বেশ নিয়ম-নীতি আছে। টেলিভিশনে কখনোই নগ্নতা দেখানো হয় না, খারাপ কথা বলা হয় না। আকারে-ইঙ্গিতে অনেক বড় বড় জিনিস বুঝিয়ে দেয়া যাবে কিন্তু সেটি সোজাসুজি দেখানো যাবে না। টেলিভিশনে সুন্দরী মেয়েদের সাঁতারের পোশাক বা বিকিনি পরিয়ে দেখানো একটি জনপ্রিয় ব্যাপার (সাঁতারের পোশাক যে কত ছোট হতে পারে সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না) এবং সেটি নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। একবার হঠাৎ হৈচৈ শুরু হয়ে গেল, পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি আলোচনা, ব্যাপার কি ? ব্যাপার আর কিছুই নয়, টেলিভিশনে মেয়েদের অন্তর্বাসের বিজ্ঞাপনে একটি মেয়েকে শুধুমাত্র অন্তর্বাস পরা অবস্থায় মুহূর্তের জন্যে দেখানো হবে। সাঁতারের পোশাক যদিও সেটি সুতার মতো এক চিলতে কাপড়, সেটি লোকজনের সামনে পরতে লজ্জা নেই, কিন্তু অন্তর্বাস যদিও সেটা প্রায় পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে সেটি কাউকে দেখানো ভারি লজ্জার ব্যাপার।

আমেরিকাতে মাঝে মাঝেই দোকানপাটে সেল (SALE) হয়, সেল মানে বিক্রি। দোকানপাটে বিক্রি হবে সেটা নিয়ে গল্প করার কি আছে ? কিন্তু আমেরিকাতে "সেল" শব্দটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেল বলতে বুঝানো হয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে বিক্রি করা। সেলেরও আবার রকমফের আছে, কোনোটি ভাল, যেখানে ভালো ভালো জিনিস একেবারে পানির দরে বিক্রি করা হয়, আবার কোনোটি খারাপ, যেখানে পঁচা জিনিস দাম কমিয়ে গছিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। কোন্টা ভাল সেল কোন্টা খারাপ সেল বুঝতে হলে দোকানপাটে নিয়মিত ঘোরাঘুরি করতে হয়, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে জিনিস কিনতে হয়। যারা করে তারা ভালো বলতে পারে, আমি এ ব্যাপারে কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি নই, তবুও যখন এক ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে দেখি সতের সেন্ট করে আন্ডারওয়ার বিক্রি হচ্ছে, বুঝতে দেরি হল না সেলটি খারাপ নয়। এক কাপ কফি খেতে পঞ্চাশ সেন্ট লাগে, কাজেই আন্ডারওয়ারগুলি যে সস্তায় দিয়েছে, বলাই বাহুল্য। সম্ভ্রান্ত ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, বাজে জিনিস বিক্রি করে না, তবু আন্ডারওয়ারগুলি কিনতে আমি ইতস্ততঃ করতে থাকে। কারণ আন্ডারওয়ারগুলি রঙিন, শুধু যে রঙিন তাই নয়, সেখানে বিচিত্র সব নক্শা কাটা, দেখলে মাথা ঘুরে যাবার মতো অবস্থা হয়। কিন্তু আন্ডারওয়ার অত্যন্ত ব্যক্তিগত জিনিস, সেটি আর কে দেখবে এই বিশ্বাসে আমি প্রায় এক ডজন আন্ডারওয়ার কিনে নিলাম।

এর পর বছর দুয়েক কেটে গেছে, আমি আমরা সতের সেন্টের আন্ডারওয়ারে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আজকাল বিচিত্র সব রঙ চোখেও পড়ে না। আন্ডারওয়ারগুলি ভালো, দু বছরে ছেঁড়া দূরে থাকুক রঙ পর্যন্ত এতটুকু ম্লান হয়নি। এর মাঝে একদিন ঘটল অঘটন।

ইউনিভার্সিটিতে সকালে কাজ করতে গিয়ে দেখি কেমন জানি গা গুলাচ্ছে, তাই সকাল সকাল বাসায় চলে এলাম। আসতে আসতেই দেখি শরীর ভয়ানক খারাপ লাগছে, বাসায় পৌঁছেই বমি করতে হল একবার। মুখ ধুয়ে পরিষ্কার হতে হতেই আবার বমি, তারপর আবার, তারপর চলতেই থাকল। বমি করার মতো বাজে জিনিস আর কি হতে পারে, বিশেষ করে সেটার উপর যদি নিজের কোনো হাত না থাকে। কিছুক্ষণেই আমি একেবারে কাহিল হয়ে পড়লাম। আমি তখন ছাত্র মানুষ, নিজের গাড়ি নেই, এক বন্ধুকে ফোন করলাম, সে তখনি আমাদের সেক্রেটারী মেয়েটিকে তার গাড়িসহ নিয়ে হাজির হল, তার পর সবাই মিলে ধরাধরি করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

ভাবলাম হাসপাতালের ডাক্তার আমার এই অবস্থা দেখে প্রচণ্ড হৈচৈ চেঁচামেচি শুরু করে দেবে, কোথায় কি! আমাকে এক নজর দেখেই বলল, ও! স্টমাক ফ্লু!

ফ্লু যে পেটেও হতে পারে আমি তখনো সেটা জানতাম না, চিঁ চিঁ করে বললাম, কি ওষুধ দেবে ?

ওষুধ! ডাক্তার মহিলাটি একগাল হেসে বলল, ফ্লুর আবার ওষুধ আছে নাকি! এমনিতেই ভালো হয়ে যাবে।

একটা ইনজেকশান দিয়ে দিচ্ছি, বমি থেমে যাবে। সে কাগজে খস খস করে একটা ইনজেকশানের নাম লিখে নার্সের হাতে ধরিয়ে দিল।

নার্স মেয়েটির বেশ বয়স হয়েছে, আমাকে একটা কেবিনে শুইয়ে দিয়ে সে সিরিঞ্জে করে ইনজেকশান নিয়ে আসে। আমি ইনজেকশান নেবার জন্যে হাতের আস্তিন গুটাচ্ছি, সে মাথা নেড়ে বলল, হাতে নয়, তোমার পাছায় দিতে হবে।

আমি আর কি করব, লজ্জার মাথা খেয়ে প্যান্ট খুলে নামালাম, সাথে সাথে নার্সের বিস্ময়ধ্বনি শোনা গেল, ওরে বাবা! কি সাংঘাতিক!

আমি চিঁ চিঁ করে বললাম, কি হয়েছে ?

আমাকে উপেক্ষা করে নার্স উচ্চস্বরে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়, দেখে যাও তোমরা কে কে আছ, দেখে যাও কি সাংঘাতিক আন্ডারওয়ার! কি আশ্চর্য সব রঙ!!

আমি মনে মনে বললাম, হে ধরণী, দ্বিধা হও!

ধরণী দ্বিধা হল না এবং কয়েকজন নার্স এসে ঢুকল। তাদের সম্মিলিত চিৎকার এবং উচ্ছ্বাসের মাঝখানে আমার রঙিন আন্ডারওয়ার নামিয়ে ইনজেকশান দেয়া হল।

ঘন্টাখানেক পর ডাক্তার আমাকে দেখতে এসেছে। ইনজেকশানের ক্রিয়ায় আমি তখন আধো-ঘুম আধো-জাগা অবস্থায়। শুনতে পেলাম সে নার্সের সাথে আমার অবস্থার কথা আলোচনা করছে। কাজের কথা শেষ করে নার্স বলল, তুমি একটু আগে আসতে পারলে একটা সাংঘাতিক জিনিস দেখতে পারতে।

কি জিনিস ?

আন্ডারওয়ার। এমন চকমকে রঙের আন্ডারওয়ার তুমি জীবনেও দেখনি।

সত্যি।

সত্যি। আশ্চর্য সব রঙ।

ডাক্তার ভদ্রমহিলা সময়মতো আসতে পারেনি বলে বার বার মুখে চুকচুক শব্দ করে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগল। আরেকটু আগে এলেই সে যে এমন একটা দর্শনীয় জিনিস দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হত না সেটা যেন সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না।

আমি আবার মনে মনে বললাম, হে ধরণী, দ্বিধা হও, আমি আমার চকমকে আন্ডারওয়ার নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ি।

ধরণী দ্বিধা হল না, আমাকে আমার রঙিন আন্ডারওয়ার নিয়ে শুয়ে থাকতে হল।

১৯৮৪

ভিন্ন চোখে

শেষবার আমি যখন দেশে গিয়েছি তখন সেখানে ইলেকশান হচ্ছে, ভাবলাম, এসেছি যখন ভোটটা দিয়েই যাই। বিকেলের দিকে সময় করে ভোট দিতে গিয়ে দেখি, অন্য কেউ আমার ভোটটা দিয়ে গেছে। উপস্থিত লোকজন আমাকে বকাবকি করে বলল, ভোট দিতে চাইলে সকাল সকাল আসতে হয় না ? লোকজন কি আপনার জন্যে বসে থাকবে নাকি, ভোট তো দিয়েই দেবে। আমি নিজের নির্বুদ্ধিতায় একটু লজ্জা পেয়েই ফিরে এলাম। ভোটকেন্দ্রের অবস্থা দেখে ভোট দেয়ার ইচ্ছা অবশ্যি আগেই উবে গিয়েছিল, সরকারি দল ছাড়া আর অন্য কোনো দলের এজেন্ট নেই, ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেয়া হয়েছে। আমি থাকতে থাকতেই এজেন্টের কিছু আত্মীয়স্বজন তার সাথে দেখা করতে এল, কথাবার্তা বলে বিদায় নেবার সময় এজেন্ট ভদ্রলোক বললেন, এসেছিস যখন তোরা কিছু ভোট দিয়ে যা।

একজন বলল, আমরা ভোট দিয়ে এসেছি।

দিয়েছিস তো কি হয়েছে, আবার দে।

বন্ধু-বান্ধব সাথে সাথেই রাজি। সবার সামনেই তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে আরো কিছু ভোট দিতে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর ভোট দেয়ার চেষ্টা করাটাই ছ্যাবলামীর পর্যায়ে পড়ে যায়।

সেবার ঢাকা গিয়েছি গরমের সময়। গরমও পড়েছে প্রচণ্ড, বাতাসের আর্দ্রতাও মনে হয় শতকরা একশ ভাগ। দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থেকে গরম সহ্য করার ক্ষমতাটাও গেছে কমে। সারা দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে বৃষ্টির জন্য বসে থাকি কিন্তু বৃষ্টির আর দেখা নেই। ঠিক তখন সারা দেশে একটা বাজে ধরনের ফ্লু ভাইরাস ঘোরাঘুরি করছে, প্রথম সুযোগে সেটা আমাকে কব্জা করে নিল। ভুগে ভুগে একেবারে কাহিল হয়ে গেলাম। অনেক কষ্টে সামলে নিতে নিতে দেখি ছুটি প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এর মাঝে একদিন রাতে রিক্শা করে ফিরে আসছি, কলাবাগানের কাছে হৈ-হৈ করে প্রায় জনা কুড়ি হাইজ্যাকার আমাকে ঘিরে ধরল, কিছু বুঝার আগে আমার মানিব্যাগ, ঘড়ি তাদের হাতে। শেষ মুহূর্তে কি মনে করে দলের পাণ্ডাটি আমার চশমাটাও কেড়ে নিল, সাথে সাথে সারা দুনিয়া ঝাপসা হয়ে গেল আমার সামনে। ভয় কিংবা রাগ নয়, কেন জানি ভারি মন খারাপ হয়ে গেল তখন। ওদের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র ছিল কিন্তু কপাল ভালো, আমার উপরে ব্যবহার করেনি, সেটাই তখন আমার একমাত্র সান্ত্বনা। ঢাকায় তখন ডাক্তারদের স্ট্রাইক, কোনো রকম জখম হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা হবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই।

আরো কিছু ঘটার আগেই ছুটি শেষ, ফিরে আসতে হল পরবাসে।

সবাই নিশ্চয় ভাবছেন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু সেটা ঠিক নয়, যাদের ইচ্ছেয় কিংবা অনিচ্ছায় বিদেশে থাকতে হয় শুধু তারাই জানে এত রকম সমস্যা, এত রকম জটিলতা থাকার পরও নিজের দেশ হচ্ছে নিজের দেশ, যেটা আর কোনো কিছু দিয়ে পূরণ করা যায় না। প্রত্যেকবার দেশ ছাড়ার সময় প্লেন যখন রানওয়েতে ছুটতে শুরু করে, আমার মনে হয় ভিতরে কি একটা যেন ছিঁড়ে গেল। দেশের বন্ধন বড় কঠিন জিনিস, কিছুতেই আলগা হতে চায় না। নিচে তাকিয়ে চোখ ভিজে আসে আর মনে হয়, কেন যাচ্ছি আমি সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে ?

যারা বিদেশে থেকেছে শুধু তারাই বুঝবে আমি কি বলছি, অন্যেরা বলবে, ব্যাটার ন্যাকামোটা দেখেছ ?

বিদেশে আসার প্রথম কষ্ট হচ্ছে ভাষা, বিদেশী ভাষা বলার কষ্ট নয়, নিজের ভাষা বলতে না পারার কষ্ট। অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে কিন্তু হঠাৎ করে কাউকে নিজের ভাষায় কথা বলার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দিলে এক সময় তার শারিরীক কষ্ট হতে থাকে। প্রথমে আমি ইউনিভার্সিটির চল্লিশ হাজার ছাত্রের মাঝে একমাত্র বাংলাদেশের ছাত্র। বাংলায় কথা না বলে একদিন-দুদিন করে এক সপ্তাহ পার হয়ে গেল, সামনাসামনি তো নয়ই, টেলিফোনেও নয়। শেষের দিকে প্রায় খ্যাপার মতো হয়ে গেলাম, পথে-ঘাটে দোকানপাটে যেখানেই আমাদের এলাকার লোকজনের মতো দেখতে কাউকে পাই, ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, তোমার দেশ কোথায় ? তুমি কি বাংলা বলতে পার ?

একদিন একজনকে পেলাম, সে একগাল হেসে বলল, আমি বোম্বে থেকে এসেছি, আমার একজন বাঙালি বন্ধু ছিল, তার কাছ থেকে আমি একটা বাংলা কথা শিখেছি, শুনবে?

আমি কিছু বলার আগেই সে কথাটা শুনিয়ে দিল, একটি কুৎসিত বাংলা গালি, যেটি একবার উচ্চারণ করলে মুখ দুবার সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হয়!

আমি তবু হাল ছাড়িনি, এর মাঝে একজন খোঁজ দিল যে, আমাদের ডর্মিটারীতে নাকি পশ্চিম বাংলার একটি ছেলে থাকে, সম্ভবতঃ সে বাংলা জানে। খুঁজে খুঁজে তাকে বের করেছি, সে তখন খাচ্ছে ডাইনিং রুমে। আমি প্রথমে ইংরেজিতেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি বাঙালি ?

সে বলল, ইয়া (অর্থাৎ ইয়েস)।

আমি এবার সাগ্রহে বাংলায় জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তাহলে বাংলা জানেন ?

ইয়া।

আমি তবু আশা না ছেড়ে সাগ্রহে বললাম, আপনি তাহলে বংলায় কথা বলতে পারেন?

ইয়া, আই ক্যান। ছেলেটি মাছের মতো চোখে আমার দিকে তাকিয়ে পরের প্রশ্নের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, আমি জিজ্ঞেস না করেই বুঝতে পারি সে তার উত্তরও ইংরেজিতেই দেবে। আর একটি কথা না বলে বেকুব হয়ে আমি ফিরে এলাম।

এই পর্যায়ে আমি মোটামুটি আশা ছেড়ে দিয়েছি। একদিন ডাইনিং রুমে বসে খাচ্ছি, হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন আমাকে জাপটে ধরল, তাকিয়ে দেখি একটি

বাঙালি ধরনের ছেলে, আমার দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে পরিস্কার বাংলায় বলল, তুই বাংলাদেশের?

আমি সামলে নিয়ে বললাম, হ্যাঁ। তুমি কোথা থেকে ? তুই কথাটি ঠিক আমার মুখে আসে না।

কোলকাতা। ছেলেটি টেবিলে বসে থাকা অন্যান্য আমেরিকান ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, এ বাংলাদেশের। পৃথিবীতে এর দেশ থেকে সুন্দর দেশ আর একটিও নেই, এর দেশে নদীতে যখন পাল তুলে নৌকা যায়, ধানক্ষেতে যখন বাতাস খেলে যায় সেটি একটি অবিশ্বাস্য দৃশ্য- ইত্যাদি ইত্যাদি।

ছেলেটি দম নেবার জন্যে একটু থামতেই আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কবে গিয়েছ বাংলাদেশে ?

কখনো যাইনি, আমার বাবা-মা বরিশালে থাকতেন, দেশ ভাগাভাগির সময় চলে এসেছেন। তাঁদের কাছে গল্প শুনেছি।

সেই থেকে সে আমার বন্ধু।

কোলকাতার ছেলে, যে কখনো বাংলাদেশে যায়নি তার চোখে বাংলাদেশ কেমন দেখায় সেটা ঠিক আমার আলোচনার বিষয় নয়। আমাদের চোখে আমাদের দেশ যদি মধুর না মনে হয় আমরা বেঁচে থাকব কি নিয়ে ? কিন্তু অন্যেরা কী ভাবে?

বেশিরভাগ আমেরিকানরা জানে না যে বাংলাদেশ বলে একটা দেশ আছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, আমেরিকানরা পৃথিবীর ছোটখাট বেশিরভাগ দেশকেই চেনে না, এর কারণটি খুব সহজ। এদেশে খবরাখবর আদান-প্রদানের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে টেলিভিশন, টেলিভিশনে খবরের জন্যে সময় দেয়া হয় খুব কম, যেটুকু দেয়া হয় সেটির শতকরা আশিভাগ হচ্ছে স্থানীয় খবর, তার বেশিরভাগই হচ্ছে খুন-জখমের রিপোর্ট। সন্ধ্যেবেলা সাধারণতঃ বড় খবরটি সারা আমেরিকাতে টেলিকাস্ট করা হয়ে থাকে। ব্যাপারটি নিয়ে অনেক ধরনের বাড়াবাড়ি করা হয়ে থাকে। খবর যারা পড়ে তাদেরকে অনেকটা সুপারস্টার হিসেবে বিবেচনা করানো হয়, তাদের বেতন বছরে কয়েক মিলিওন ডলার। এত আয়োজনের পর যে খবরটি পড়া হয় সেটি অত্যন্ত নিম্ন মানের। প্রথমে মিনিট দশেক থাকে খবর, তার পর শুরু হয়ে যায় সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর রিপোর্ট। খবরের অংশটুকুর পুরোটাই হয় আমেরিকার খবর। পৃথিবীর বাইরের খবর দেয়া হয় যদি তার সাথে আমেরিকার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ কোনো ধরনের যোগাযোগ থাকে।

আমেরিকাতে স্বাভাবিক উপায়ে পৃথিবীর খবর পাওয়া যায় না, তাই অনেকে ভাবতে পারে যে, একটু চেষ্টা করলে হয়ত অন্য কোনো উপায়ে, টাইম, নিউজ উইক বা এধরনের সংবাদ সাময়িকী থেকে খবরটা পেতে পারে, কিন্তু সেটি সত্যি নয়। একটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে, প্রেসিডেন্ট জিয়া যখন চট্টগ্রামে মারা গেলেন, খবরটা প্রথম সপ্তাহে নিউজ উইকে ছাপানো হয়নি, দ্বিতীয় সপ্তাহে খবরটি ছোট করে ছাপা হল, কিন্তু তার মাঝে ছিল একাধিক ভুল তথ্য। আমি একটু রেগে নিউজ উইককে চিঠি লিখার পর তারা ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখে আমাকে জানাল যে, নিউজ উইকের আন্তর্জাতিক সংখ্যায় তারা খবরটি সময়মতোই ছেপেছিল। তখন

আমি প্রথমবার জানতে পারলাম, নিউজ উইকের মতন তথাকথিত সম্ভ্রান্ত পত্রিকার একটি আন্তর্জাতিক এবং একটি আমেরিকান সংস্করণ রয়েছে। আমেরিকান সংস্করণে পৃথিবীর খবরাখবর বিশেষ থাকে না, পত্র-পত্রিকার হর্তাকর্তারা নিশ্চই ধরে নিয়েছেন, আমেরিকানদের পৃথিবীর খবরাখবরের প্রয়োজন নেই, কাজেই এটা মোটেও বিচিত্র নয় যে, একজন সাধারণ আমেরিকান বাংলাদেশ কোথায় তা কখনোই জানার সুযোগ পাবে না। আগে যখন অপারেটরের মাধ্যমে বাংলাদেশে ফোন করা হত তখন একবার এক অপারেটারকে বলতে শুনেছি, বাংলাদেশ ? সেটা জানি কোনো স্টেটে, ওকলাহোমাতে, তাই না ? বাংলাদেশে রাস্তায় হাতি চলাচল ক'রে কি না সেটি আমাকে এখনো প্রায়ই জিজ্ঞেস করা হয়। তবে আমি একবার স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যখন একজন উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা আমার কাছে জানতে চাইলেন বাংলাদেশের খোলা বাজারে ক্রীতদাস বেচা-কেনা হয় কি না।

বাংলাদেশকে যে সাধারণ আমেরিকানরা চেনে না ব্যাপারটাকে অবশ্যি আমি একটা আশীর্বাদ হিসেবেই দেখি। তার কারণ সহজ, যে কয়জন বাংলাদেশের কথা শুনেছে সবাই জানে এটা পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশ, এদেশের মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যায়, এদের থাকার ঘর নেই, পরার কাপড় নেই, এদেশ দুঃশাসন আর দুর্নীতিতে অচল। একটি দেশকে যে এত খারাপ ভাবে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা যায় সেটি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এখন পর্যন্ত একবারও এমন হয়নি যে খবরে কোনো কারণে বাংলাদেশের কথা বলা হয়েছে এবং তখন সবাইকে মনে করিয়ে দেয়া হয়নি যে এটি পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র দেশ। আমার সুদীর্ঘ প্রবাসজীবনে সবচেয়ে দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, টেলিভিশনের একটি হাস্য-কৌতুকের অনুষ্ঠানে, যেখানে একজন বাংলাদেশকে নিয়ে রসিকতা করছে এবং উপস্থিত দর্শক তা দেখে হেসে কুটি কুটি হয়ে যাচ্ছে। রসিকতাগুলিতে বলা হচ্ছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ সব সময়েই ক্ষুধার্ত হয়ে থাকে, তারা এত ক্ষুধার্ত যে যখন হাতের কাছে যা-ই পায় তা-ই খেয়ে ফেলে,এবং এই ধরনের আরো কিছু অশালীন ব্যাপার। আমি টেলিভিশন স্টেশনে ফোন করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। এর বেশি কি করতে পারি?

কিছুদিন আগে অফিসে টেলিফোন এসেছে, আমি টেলিফোন ধরেছি, কে যেন বলল, আস্‌সালামু আলাইকুম জাফর ইকবাল সাহেব।

আমি সালামের উত্তর দিয়ে বললাম, কে, আলাউদ্দিন সাহেব নাকি ? আমার পরিচিত বাঙালির সংখ্যা খুব সীমিত, তাই ভাবলাম তাদের কেউ হবেন।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, আপনি আমাকে চিনবেন না, আপনার সাথে আগে কখনো দেখা হয়নি।

ও আচ্ছা। কোথা থেকে ফোন করছেন ?

এই তো অরেঞ্জ কাউন্টি থেকে। আমার নাম. . . ভদ্রলোক নিজের নাম বললেন, একটি আমেরিকান নাম।

আমি থতমত খেয়ে বললাম, আপনি. . .

আমি আমেরিকান।

কী অবিশ্বাস্য ব্যাপার, কী চমৎকার বাংলা বলেন আপনি ?

ভদ্রলোক তাঁর বাংলার প্রশংসা শুনে মহাখুশি, হেসে বললেন, আপনাকেও ঘোল খাইয়ে দিলাম হা হা হা।

এর পর খানিকক্ষণ কাজের কথা হল। বেশ লাগে তাঁর সাথে কথা বলতে, বাংলায় বিদেশী কোনো টান নেই বরং চট্টগ্রামের আঞ্চলিক ভাষার সূক্ষ্ম একটা ছোঁয়া আছে। বাংলাদেশের জন্যে কেমন জানি একটা দরদ রয়েছে ভদ্রলোকের, আমার কাছে যেটা বেশ ভালো লাগে। আমি এটা আগেও লক্ষ্য করেছি, এখানকার যারা বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে মেশার সুযোগ পেয়েছে তারা সবাই কোনো এক কারণে কোমল অনুভূতি নিয়ে ফিরে এসেছে। ব্যাপারটার সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে স্টীভ।

স্টীভ হচ্ছে আমার এক মাইক্রোবায়োলজিস্ট আমেরিকান বন্ধু। ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনে সে আমাকে খুঁজে বের করেছিল, তার বাংলাদেশে যাবার কথা, তাই। আমাকে বলল, তুমি আমাকে বাংলা শেখাতে পারবে ?

আমি মোটামুটি আকাশ থেকে পড়লেও খুশি হয়ে রাজি হলাম। এরকম উৎসাহী ছাত্র আমি জীবনেও পাইনি। দুই সপ্তাহের মাঝে সে বাংলায় এ ধরনের কঠিন কঠিন বাক্য বলা শুরু করল : ঢাকা গিয়ে আমি আমার বউকে ফোন করব। মোটামুটি একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বাংলা শেখাতে গিয়ে শুধু একটি সমস্যা– সে 'ত' উচ্চারণ করতে পারে না, আমি যতবার বলি 'তোমার নাম কি ?' সে ততবার বলে 'টোমার নাম কি ?' শুধু যে উচ্চারণ করতে পারে না তাই না, আমি যখন 'ত' এবং 'ট' উচ্চারণ করি, সে দুটোর মাঝে পার্থক্যটুকুও শুনতে পায় না। এটা হচ্ছে ভাষার একটা মজার ব্যাপার, যে ভাষায় এ যে জিনিসটি নেই সে ভাষার লোকজন সেটা কেন জানি শুনতেও পায় না।

বাংলাদেশে যাবার আগে স্টীভের নানা রকম উদ্বেগ– ভিন্ন দেশ, ভিন্ন কালচার, কি হতে কি হবে কে জানে। আমি তাঁকে নানাভাবে সাহস দিতে থাকি। যাবার আগের দিন শুকনো মুখে স্টীভ এসে হাজির, আমাকে নিজের দাড়ি দেখিয়ে বলল, তোমার কি মনে হয় দাড়িটা কামিয়ে ফেলব ?

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন ?

তোমাদের দেশে তো বেশির ভাগ লোক মুসলমান, দাড়ি রাখা তো মুসলমানদের ধর্মের একটা অংশ, আমার দাড়ি দেখে যদি ভাবে ফাজলেমী করছি ?

আমি হাসি গোপন করে বললাম, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার দাড়ি কামাতে হবে না।

স্টীভের জন্যে দাড়ি কামানো একটা অবিশ্বাস্য আত্মদান বলা যায়, তার অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী স্টীভের যে কয়টি জিনিস দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, তার মাঝে একটা হচ্ছে তার দাড়ি (আরেকটা নাকি তার পোষা অজগর সাপ, আমাদের সাথে যখন তাদের দেখা হয়েছে ততদিনে সেই সাপ দেহত্যাগ করেছে)।

স্টীভ বাংলাদেশে প্রায় তিন মাস কাটিয়ে এল। মাইক্রোবায়োলজিস্ট মানুষ ডায়েরিয়া নিয়ে গবেষণা করতে গিয়েছে, এর জন্য বাংলাদেশ থেকে ভালো জায়গা

আর কি হতে পারে ? দেশে কাজকর্মে যে ওর সমস্যা হয়নি তা নয় কিন্তু ফিরে এসেছে মহা খুশি হয়ে। বাংলাদেশের অসংখ্য ছবি তুলে এনেছে, সেগুলি দেখতে যেতে হল। আমি একটু ভয়ে ভয়েই গেলাম। বিদেশীরা বাংলাদেশে গিয়ে দরিদ্র অপুষ্ট শিশুর ছবি ছাড়া আর কোনো ছবি তুলতে চায় না। স্লাইডগুলি দেখে শেষ করতে করতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল, বললে কেউ বিশ্বাস করবে না, স্লাইডের প্রায় সবগুলিই হচ্ছে নৌকার। পাল তোলা নৌকা, পাল ছাড়া নৌকা, ডিঙ্গি নৌকা, জেলে নৌকা, বড় নৌকা, ছোট নৌকা, মাঝারী নৌকা, গুন টানা নৌকা, বেদে নৌকা– কি নেই। কোনো মানুষ যে নৌকাকে এত পছন্দ করতে পারে সেটি তার স্লাইডে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বাংলাদেশে তার অভিজ্ঞতা নিয়ে গল্পগুজব হল। তার মাঝে কয়েকটি বেশ মজার।

প্রথম গল্পটি হল তার খাওয়া নিয়ে। নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার স্থানীয় রোগজীবানু নিয়ে সাবধানে থাকতে হয়। বাংলাদেশ ব্যাপারটি আরো বেশি গুরুতর, কারণ সেখানে নাকি নানা ধরনের ডায়েরিয়ার জীবাণু আছে, যেটি আর কোথাও নেই। খাওয়া নিয়ে তাই স্টীভ বাড়াবাড়ি সতর্ক, বাইরে বের হলে সে খেত খুব সাবধানে। জীবাণুমুক্ত খাবারের তার উদাহরণটি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। রাস্তার পাশে দিনমজুর বা রিক্শাওয়ালারা যেখানে খায় সেও সেখানে খেত, সেখানে রুটিগুলি তার চোখের সামনে উত্তপ্ত তাওয়াতে গরম করা হত, কাজেই স্টীভ নিশ্চিতভাবে জানত যে সেগুলি জীবাণুমুক্ত। বিদেশীরা ঝাল খেতে পারে না বলে আমাদের প্রচলিত যে বিশ্বাস রয়েছে সেটাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে স্টীভ কাঁচা মরিচ দিয়ে রাস্তার পাশে দিনমজুরদের সাথে বসে মোটা রুটি খেয়ে যাচ্ছে দৃশ্যটি আমি প্রায়ই কল্পনা করে দেখি।

স্টীভ সিগারেট খাওয়া একেবারে দুচোখে দেখতে পারে না। দেশে যাবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, দেশের মানুষজন কাউকে যদি ছোটখাট কোনো উপহার দিতে হয় তাহলে কি দেয়া উচিত ? সে এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে চায়। আমি বললাম ভালো সিগারেট কিনে নিতে। দেশে মোটামুটি সবাই সিগারেট খায়, ভালো সিগারেট পেয়ে খুশি হয় না এরকম মানুষ একজনও নেই। স্টীভ মাথা নেড়ে বলল, কভি নেহী, আমি সিগারেট খাই না এবং আমি কাউকে সিগারেট খেতেও দিই না। সেই স্টীভ ঢাকায় একদিন রিকশা করে যাচ্ছে, রিক্শাওয়ালা ফস করে সিগারেট ধরিয়ে বসল। দেশে রিক্শাওয়ালারা সাধারণত এরকম করে না, সে কেন করল কারণটা আমি এখনো বুঝতে পারিনি। স্টীভ স্বাভাবিকভাবে আপত্তি জানিয়ে বলল সিগারেট নিভিয়ে দিতে। রিক্শাওয়ালা ঘুরে তার দিকে তাকিয়ে রিক্শা থামিয়ে বলল, নেমে যাও আমার রিক্শা থেকে। স্টীভ আর কি করে। রিক্শা থেকে নেমে গেল। দোষ অবশ্যি রিক্শাওলারই কিন্তু কেন জানি ঘটনাটা শুনে রিক্শাওয়ালার ওপর মোটেও রাগ করতে পারিনি, বরং রিক্শাওয়ালার এই ছেলেমানুষী আত্মসম্মানবোধের জন্য খানিকটা অহঙ্কারই হতে থাকে। সাদা চামড়ার লোকজনের পা-চাটার জন্যে আমরা সবাই যেভাবে ঘুরি-ফিরি, তার মাঝে এই রিক্শাওয়ালার বিচিত্র বিতৃষ্ণাটুকু চোখে পড়ার মতো।

বাংলাদেশের যে জিনিসটা স্টীভের খুবই পছন্দ সেটা হচ্ছে রিক্শা। রিক্শায় যাওয়ার সময় এক গাড়ি ধাক্কা দিয়ে তার রিক্শাকে একবার উল্টে ফেলার পরও তার রিক্শা-প্রীতি বন্ধ হয়নি। একজন রিক্শাওয়ালাকে রাজি করিয়ে সে রিক্শা চালানোর চেষ্টা করে আবিষ্কার করেছে,প্যাডেল দিয়ে যেহেতু রিক্শার একটামাত্র চাকা ঘুরানো যায়, রিক্শা চালানো ব্যাপারটি খুব সহজ নয়। রিক্শা সে যত পছন্দ করে ঠিক তত সে অপছন্দ করে বেবী ট্যাক্সি। প্রধান কারণ হচ্ছে নিরাপত্তার অভাব, তারা ঢাকার জনবহুল রাস্তায় এত জোরে বেবী ট্যাক্স চালায় যে, যেকোন মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খারাপ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। স্টীভ পারতপক্ষে বেবী ট্যাক্সিতে উঠত না, কিন্তু একদিন তাকে উঠতে হল। সেদিন তার সঙ্গে আমেরিকান এম্বেসীর জনৈকা ভদ্রমহিলা, বাংলায় কথা বলতে পারে ভেবে ভদ্রমহিলা স্টীভকে বলেছেন তাঁর সাথে যেতে। বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার তার স্বভাবমত গুলির মতো ছুটিয়েছে, রাস্তায় ঝাঁকি খেতে খেতে ভদ্রমহিলার ভয়ে জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা। স্টীভ বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভারকে বলল, আস্তে চালাও। সে বাংলাতেই চলছে কিন্তু ড্রাইভার তার কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না, যেভাবে চালাচ্ছিল সেভাবেই চালাতে থাকল। স্টীভ আবার বলল, আস্তে চালাও, কিন্তু কোনো কাজ হল না। স্টীভ আরো কয়েকবার চেষ্টা করল কিন্তু তবুও কোনো কাজ হল না। এই পর্যায়ে তার মেজাজ গেছে খারাপ হয়ে। আমি তাকে কোনো গালি শেখাইনি (জানি না বলে নয়, তার কোনো কাজে লাগবে বলে ধারণা ছিল না)। স্টীভ নিজের উদ্যোগে এখানে পৌছেই কিছু কুৎসিত গালি শিখে নিয়েছিল। তারই একটা এবারে সে চিৎকার করে বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের ওপরে ব্যবহার করল। বেবী ট্যাক্সির ড্রাইভার চমকে উঠে ঘুরে একবার তার দিকে তাকাল, তারপর হো হো করে সে কি হাসি, কিছুতেই নাকি হাসি থামাতে পারে না। শুধু তাই নয় বেবী ট্যাক্সির গতিও কমিয়ে আনল সাথে সাথে। পাশে বসা ভদ্রমহিলা অবাক হয়ে বললেন, কি কথাটা তুমি ওকে বলেছ ? যাদুর মতো কাজ হল দেখি, শিখিয়ে দেবে আমাকে ?

স্টীভ তাকে শেখায়নি, কীভাবে শেখায়, বেবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের মায়ের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন সংক্রান্ত একটা কথা, ভদ্রমহিলাদের মুখে সেটা কি মানায় ?

বাংলাদেশের যে জিনিসটি স্টীভের সবচেয়ে পছন্দ সেটা হচ্ছে লুঙ্গি। আমেরিকাতেও সে এখন বাসায় সবসময় লুঙ্গি পরে থাকে। তার লুঙ্গি পরার ধরনটা অবশ্যি একটু বিচিত্র, খানিকটা উপরে তুলে পরে। তাকে দোষ দেয়া যায় না, সে লুঙ্গি পরা শিখেছে ঢাকার একজন রিক্শাওয়ালার কাছে, বেচারা রিক্শাওয়ালারা রিক্শা চালানোর সুবিধার জন্যে একটু উঁচু করে পরে. সে সেভাবেই শিখেছে। শুধু তাই নয়, রিক্শাওয়ালারা খুচরা টাকা-পয়সা, বিড়ি-সিগারেট যেভাবে লুঙ্গির কোচার মাঝে গুঁজে কোমরে প্যাচিয়ে রাখে, সেও তার জরুরি জিনিসপত্র তার লুঙ্গির কোচাতে প্যাচিয়ে কোমরে গুঁজে রাখে! প্রথমবার ঢাকা যাবার পর সে একাধিকবার প্রয়োজনে–অপ্রয়োজনে বাংলাদেশ গিয়েছে। ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমসের লোক একবার তার স্যুটকেস খুলে দেখে একটা বহুল ব্যবহৃত লুঙ্গি, জিজ্ঞেস করে যখন জানল স্টীভ আমেরিকাতেও লুঙ্গি পরে থাকে, সাথে সাথেই

তাকে ছেড়ে দিল। এত সহজে কাস্টমস সমস্যার সমাধান নাকি তার জীবনেও হয়নি।

স্টীভ ঠিক সাধারণ একজন আমেরিকান নয়, তার গল্প শুনলেই বুঝা যায়। সে মেকী মানুষ পছন্দ করে না, তাদের পাশ কাটিয়ে সোজাসুজি সহজ-সরল সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। সাধারণ মানুষের কাছাকাছি যাওয়া সহজ নয়, যদি যাওয়া যায় তাহলে একটা মস্ত বড় আবিষ্কার করা যায়, সেটি হচ্ছে যে পৃথিবীর সবদেশের সব মানুষ আসলে একই রকম তখন তাদেরকে ভালো না লেগে উপায় নেই।

কিন্তু সবাই তো স্টীভ নয়, সবাই তো রিক্শাওয়ালার কাছে লুঙ্গি পরা শিখে না, দিনমজুরের সাথে রাস্তার পাশে বসে গরম রুটি খায় না। সাধারণ একজন আমেরিকান বা বিদেশী যখন বাংলাদেশে যায় তখন তারা কি বলে ? যারা গাড়ি করে ঘুরে জানলার কাঁচ দিয়ে বাংলাদেশকে দেখে, যারা মেকী মানুষের বাসায় বসে ইংরেজিতে কথা বলে, যারা সভ্য মানুষজনের বাসায় বসে বিয়ার খেয়ে ফিরে আসে, তাদের বাংলাদেশ সম্পর্কে কি ধারণা ?

আমি সেটা জানি কিন্তু আমি সেটা লিখতে চাই না।

ক্যালটেক

বারশ মাইল গাড়ি চালিয়ে প্যাসাডিনা এসেছি, যতক্ষণ রাস্তায় ছিলাম হারানোর কোনো ভয় ছিল না, শহরে ঢোকা মাত্র হারিয়ে গেলাম। মিনিট পনের ইতস্তত ঘোরাঘুরি করে ঠিক করলাম কাউকে জিজ্ঞেস করি, ক্যালটেক কীভাবে যাওয়া যায়। ক্যালটেক পৃথিবীর সেরা গবেষণা কেন্দ্রের একটি, এখান থেকে কুড়ি জনেরও বেশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী বের হয়েছেন, শহরের মানুষ এটাকে না চিনলে আর কি চিনবে ? গাড়ি থামিয়ে প্রথম যাকে পেলাম তাকেই জিজ্ঞেস করলাম, ভাই, ক্যালটেক কোন্‌দিকে বলতে পারেন?

লোকটি ভুরু কুঁচকে বলল, ক্যালটেক ? সেটি আবার কি ?

আমি থতমত খেয়ে গেলাম, বাঙালির ভাত খাওয়া ইংরেজি "থ্রি" বললে লোকজন সেটাকে "টু" শুনে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারেনি আমি কি বলছি। আমি আবার পরিষ্কার করে বললাম ক্যালটেক, ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউটট অব টেকনোলজী।

লোকটা ঠোঁট উল্টে বলল, জানি না।

আমি বেশ দমে গেলাম। দেশে বসে যে শিক্ষাঙ্গনের কথা শুধু কল্পনা করেছি, প্যাসাডিনার লোক হয়ে সেটাকে চেনে না ? সাহস করে কাছাকাছি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সে মাথা চুলকে বলল, ক্যালকেট ? শুনেছি নাকি ক্যালিফোর্নিয়াতে–

আমার মাথায় বজ্রপাত হল, ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট প্রায়ই দুই হাজার মাইল লম্বা! গাবতলী গরুর হাট কোথায় জিজ্ঞেস করলে কেউ যদি উত্তর দেয় "বাংলাদেশে", তাহলে যেরকম এটাও সেরকম শোনাল। আমি মুখ লম্বা করে গাড়িতে ফিরে এলাম।

যাই হোক, ক্যালটেক শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছিলাম– পেয়ে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। দ্বিতীয় লোকটি যখন বলেছে ক্যালটেক ক্যালিফোর্নিয়াতে, সে বলতে চেয়েছে ক্যালিফোর্নিয়া বুলোভার্ড নামে একটি রাস্তাতে, আমি এইমাত্র এসে পৌঁছেছি, কিছু চিনি না বলেই সমস্যা। কিন্তু একথা সত্যি, সাধারণ মানুষ, যারা পড়াশোনা বেশি করেনি এবং পড়াশোনা নিয়ে বেশি মাথাও ঘামায় না তারা সত্যিই ক্যালটেককে চেনে না, যতই তার বিশ্বজোড়া নাম থাকুক না কেন। তার কারণ দুটি, প্রথমত, ক্যালটেক খুব ছোট একটা শিক্ষাঙ্গন, ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে সংখ্যায় দুই হাজারের বেশি নয়, কাজেই এই শহরে এর উপস্থিতি প্রায় কারো চোখেই পড়ে না। দ্বিতীয়ত, যে কারণটি আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে, ক্যালটেকের কোনো ফুটবল টিম নেই। একেবারে নেই তা নয়, শুধু ছাত্রদের দিয়ে

টিমটি করা সম্ভব হয়নি বলে কিছু শিক্ষক এবং একজন ঝাড়ুদারকে নিয়ে একটা টিম করা হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও এই ফুটবল টিম কখনো বেশিদূর এগুতে পারেনি, কাজেই রেডিও-টেলিভিশনে কখনোই তাদের খেলার খবর প্রচারিত হয় না এবং সাধারণ মানুষ কখনোই ক্যালটেকের কথা জানতে পারে না। তবে যখন ভূমিকম্প হয় তখন হঠাৎ করে সবার ক্যালটেকের কথা মনে পড়ে। এটি ভূমিকম্পের জায়গা, এখানে সপ্তাহে একটা ছোট, মাসে একটা মাঝারী এবং বছরে একটা বড়সড় ভূমিকম্প হয়। ক্যালটেকে ভূমিকম্প নিয়ে অনেক কাজকর্ম হয়ে থাকে, ভূমিকম্প মাপার রিক্টর স্কেলটিও পর্যন্ত ক্যালটেকের প্রফেসর ড. রিক্টরের নামানুসারে রাখা। যখনই এখানে বড়গোছের একটা ভূমিকম্প হয় তখন ক্যালটেকে হাঁটা মুশকিল হয়ে যায়, রাজ্যের যত সাংবাদিক আর রেডিও-টেলিভিশনের লোকজন তাদের সব যন্ত্রপাতি, গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে হাজির হয়ে যায়। ভূমিকম্পের আকার-আকৃতি, অবস্থান, পরিমাপের পাকা কথা সবসময়েই ক্যালটেকের ল্যাবরেটরী থেকে দেয়া হয়

ক্যালটেকের নাম যে একেবারে কেউই জানে না সেটা অবশ্যি একেবারে সত্যি নয়, যাদের প্রয়োজন তারা সত্যিই জানে। যেমন ধরা যাক বাড়ির মালিকেরা, তাদের বাড়ি ভাড়া দেয়া প্রয়োজন এবং ক্যালটেকের লোকজনের কাছে ভাড়া দেবার জন্যে তারা একেবারে দুপায়ে খাড়া। আমি যখন প্রথমে এসেছি তখন সময়টা বাড়ি ভাড়ার জন্য খুব খারাপ। খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে একটা এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ঢুকেছি, দেখি বাইরে বৃদ্ধ ম্যানেজার বসে আছে। জিজ্ঞেস করলাম এপার্টমেন্ট খালি আছে কি না, সে বলল, নেই। হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছিলাম, তখন ম্যানেজার ফিরে ডাকল, জিজ্ঞেস করল, কোথায় কাজ কর তুমি?

ক্যালটেকে।

ক্যালটেকে? সে উঠে দাঁড়ায়, আরে সেটা আগে বলবে তো!

আমি ঠিক বুঝতে না পেরে তার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম, সে কাছে এসে বলল, তুমি নিশ্চয়ই নতুন এসেছ এখানে?

আমি মাথা নেড়ে বললাম, হ্যাঁ।

তাই তুমি এখনো জান না এখানে কথাবার্তায় সবচেয়ে প্রথমে বলতে হয় তুমি ক্যালটেকে কাজ কর। সবাই তখন তোমার সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াবে, রাজার মতো খাতির করবে তোমাকে

আমি জানতাম না, তাই একটু দেঁতো হাসি হেসে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বৃদ্ধ ম্যানেজার ষড়যন্ত্রীর মতো কাছে এসে বলল, আমাদের এপার্টমেন্ট নেই তো কি হয়েছে, একটা জোগাড় করে নেব তোমাকে, আস তুমি আমার সাথে।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, সত্যি সত্যি সে কীভাবে কীভাবে একটা এপার্টমেন্ট জোগাড় করে দিল। অন্ধকূপের মতো তেলাপোকাদুষ্ট, বিবর্ণ, মলিন একটি এপার্টমেন্ট- তবু তো এপার্টমেন্ট!

আমি পরেও দেখেছি স্থানে স্থানে ক্যালটেক কথাটি যাদুমন্ত্রের মতো কাজ দেয়- কেন দেবে না? পৃথিবীর আর কোনো শিক্ষাঙ্গন আছে যেখানে মাত্র আটশ

শিক্ষক আর আটশ ছাত্র মিলে কুড়িজনের বেশি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বের করেছে? নোবেল পুরস্কার অবশ্যি গবেষণার সঠিক মাপকাঠি নয়, অনেক প্রয়োজনীয় গবেষণা রয়েছে যার জন্যে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি, তাই বলে সেগুলির গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। এ ধরনের গবেষণার কথা বিজ্ঞানী মহলের বাইরে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছায় না কিন্তু সেগুলিও একেবারে প্রথম শ্রেণীর গবেষণা। ক্যালটেকে সে ধরনের গবেষণাও হয় প্রচুর। সম্ভবত সে জন্যেই স্বিতসনিয়ান নামে একটি বহুল প্রচারিত সাময়িকীতে কিছুদিন আগে সোজাসুজি ঘোষণা করা হয়েছে গবেষণার জন্যে ক্যালটেক হচ্ছে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান, অন্যতম নয়, একেবারে সর্বশ্রেষ্ঠ।

গবেষণা আর পড়াশোনা ঠিক এক জিনিস নয়, তাই হঠাৎ করে কেউ যদি ক্যালটেকে এসে হাজির হয় সে খুব অবাক হয়ে যাবে। অন্য দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরকম ছাত্র ছাত্রীদের হৈচৈ হতে থাকে এখানে সেরকম কিছু নেই। ব্যাপারটা প্রথমে আমার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য মনে হত। মাঝে মাঝে হঠাৎ করে দেখা যায় একটি-দুটি ছাত্র স্কেট বোর্ডে করে গুলির মতো ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার বেশি কিছু নয়, ছাত্র-ছাত্রীরা বাইরে বসে চুটিয়ে আড্ডা মারছে সেরকম কখনোই দেখা যায় না। তার কারণ অনেকগুলি, প্রথম কারণটি হচ্ছে, এখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা খুব কম, যারা আছে তারাও নাকি মাটির নিচে দিয়ে যাতায়াত করে বলে উপরে দেখা যায় না (সত্যি সত্যি ক্যালটেকের নিচে নাকি আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল আছে)। এখানে পড়াশোনার এত চাপ যে বাইরে বসে আড্ডা মারার সময় নেই, তাছাড়া শুধু ছেলেরা বসে আড্ডা মারাটা ভালো জমে না, আড্ডা মারার জন্যে ছেলে এবং মেয়ে দুই-ই দরকার, দুর্ভাগ্যক্রমে ক্যালটেকে মেয়েরা অবিশ্বাস্য রকমের দুষ্প্রাপ্য। অন্য যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান কিন্তু ক্যালটেকে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা মাত্র পনের ভাগ! সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশের জন্যে ক্যালটেকের কর্মকর্তারা অনেকবার অনেকভাবে মেয়েদের লোভ দেখিয়ে এখানে আনার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গবেষণা কেন্দ্র এদিকে দিয়ে প্রায় সত্যি সত্যি মরুভূমির মতো!

একটি-দুটি মেয়ে যখন এখানে আসে তখন তারা এখানে কেমন সমাদর পায় সেটি সহজেই কল্পনা করে নেয়া যায়। ক্লিয়া নামে লালচুলের একটি মেয়ে এক গ্রীষ্মে আমার সাথে কাজ করতে এসেছিল, অল্পবয়সী আড্ডাবাজ একটি মেয়ে, চোখে চোখ না রাখলে সে সহজেই গল্পগুজব করে দিন কাবার করে দিতে পারে। তাকে একবার আমি একটি সার্কিট বোর্ডে ড্রিলপ্রেস দিয়ে শ'খানেক ফুটো করতে দিয়েছি। অসাবধান হয়ে একবার ড্রিলপ্রেসের খুব কাছে মাথা নিয়ে গেছে আর হঠাৎ তার চুলের একটি গোছা ঘুরন্ত ড্রিলপ্রেসে আটকে গেল, আর চোখের পলকে মাথা থেকে সেই চুলের গোছা উপড়ে এসেছে। হ্যাচকা টানে মাথা থেকে চুলের গোছা উপড়ে নেয়া থেকে বেশি যন্ত্রণাদায়ক জিনিস আর কি হতে পারে? ক্লিয়া কত কষ্টে এতটুকু শব্দ না করে চোখের পানি আটকে রাখল সে দৃশ্য আমি কখনো ভুলব না। চুল উপড়ে তুলে নিলে সেখানে আর চুল উঠে না বলে একটা কথা প্রচলিত আছে,

সেটা সত্যি নয়, কারণ ক্লিয়ার মাথায় এক বর্গ ইঞ্চি টাকমাথায় আবার চুল উঠেছিল, সময় অবশ্যি লেগেছিল প্রায় একবছর!

যাই হোক, সেই ক্লিয়া আমাদের কাছে গল্প করে শোনাত ক্যালটেকে এসে সে কী মহাসুখে আছে, ছেলেরা তাকে সাহায্য করার জন্যে কী রকম ব্যস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো কাজকর্মের জন্যে কোথাও গেলে একজনের জায়গায় নাকি দশজন ছুটে আসত সাহায্য করতে। ক্যালটেকে ক্লিয়া এত জনপ্রিয় হয়ে গেল যে হঠাৎ করে শুনি সে নাকি নির্বাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে। নির্বাচনী প্রচারণায় সে বলেছিল যে, সে প্রেসিডেন্ট হলে ছাত্র-ছাত্রীদের সামাজিক অবস্থার একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দেবে। দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক বক্তব্য রাখতে হয়, ক্লিয়ার সেরকম কোনো ঝামেলা ছিল না, নির্বাচনের পর নাচের জন্যে ঘর ভাড়া করা আর পার্টির আয়োজন করার বেশি তার আর কিছু করতে হত না!

ক্যালটেকের ছাত্র-ছাত্রীদের কাজের চাপ প্রচণ্ড, আমার পরিচিত ছাত্রদের সাথে কথোপকথনের একটি উদাহরণ দিলে সেটা বোঝা যাবে। ছাত্রটি হয়ত স্কেটবোর্ডে করে গুলির মতো ছুটে যাচ্ছে- সময় বাঁচানোর জন্যে সবসময় তারা স্কেটবোর্ডে ঘুরে বেড়ায়, আমাকে দেখে দাঁড়াল। আমি বললাম, কি খবর বব?

খবর ভালো, আজ রাতে ঘুমিয়েছি।

ঘুমিয়েছ? কতক্ষণ?

বিশ্বেস করবে না। পুরো চার ঘণ্টা! রাত তিনটা থেকে সাতটা পর্যন্ত টানা ঘুম! চমৎকার!

গত কাল দিনটা খুব খারাপ গেছে।

কেন, কি হয়েছিল গত কাল?

সাহিত্যের একটা কোর্স নিয়েছি, সারা রাত জেগে পড়াশোনা করতে হল সেজন্যে, ক্লাশে আলোচনা করার কথা। কোথায় আলোচনা, ক্লাশে গিয়ে ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেলাম।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের হোমওয়ার্ক জমা দিতে হবে আজ, সারা রাত মনে হয় ওটার পিছনেই যাবে।

সত্যি সত্যি সারা রাত, নাকি আ একটা কথার কথা?

সত্যি সত্যি সারা রাত! খোদার কসম, তবু শেষ করতে পারব কি না কে জানে!

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তোমাদের দেখে আমি সত্যি অবাক হয়ে যাই বব!

বব হেসে বলল, তুমি আমাকে দেখে অবাক হয়ে যাও তাহলে জিমকে দেখলে তুমি কি বলবে?

কেন, কি হয়েছে জিমের?

জিম কখনো ঘর থেকেও বের হয় না, টবে ঘাসের বিচি ফেলে ঘাসের চাষ করছে, ঘাস খেয়ে বেঁচে থাকে।

প্রায় মিনিট পনের সময় ব্যয় করে বব শেষ পর্যন্ত আমাকে সত্যিই বিশ্বাস করিয়েছিল যে জিম নামের একটি ছেলে সত্যি সত্যি ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে। কেন আছে আমি জানি না, কিন্তু ক্যালটেকে আজব চরিত্রের সংখ্যা অন্য যে কোনো স্থান থেকে বেশি সেটা নিয়ে এখন আমার কোনো দ্বিমত নেই! বব নিজে অসাধারণ প্রতিভাবান ছেলে, আমার সাথে যখন কাজ করত তখন দেখেছি, তাকে কিছু বলার আগেই সে মাঝে মাঝে বুঝে ফেলে আমি কি বলতে চাইছি! শুধুমাত্র টিকে থাকার জন্যেই ববের মতো ছেলের কালঘাম ছুটে যায়, অন্যদের কি অবস্থা হয় কে জানে! দেশে থাকাকালীন আমাদের অনার্স পরীক্ষা হত তিন বছর পর, আমরা দুই বছর নয় মাস ক্যান্টিনে বসে চা-সিগারেট খেয়ে কাটিয়ে দিতাম, শেষ তিনমাস ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে পড়াশোনা হত। সেই তিনমাস সময়মতো খাওয়া-দাওয়া, সময়মতো ঘুম হত বলে পরীক্ষার আগে আগে আমাদের গায়ের রঙ কিঞ্চিত পরিষ্কার এবং স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবার উদাহরণ আছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এত আরামের আন্ডারগ্রাজুয়েট জীবন শেষ করে এখানে এসে বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীর যে বাড়াবাড়ি কোনো অসুবিধে হত সেরকম কোনো নজির নেই বরং আমার পরিচিত সবাই খুব ভালোভাবেই দেশের সুনাম বজায় রেখেছে!

ক্যালটেকের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার ভয়াবহ চাপের ফাঁকে ফাঁকে চিত্তবিনোদনের জন্যে যেসব কাজকর্ম করে সেগুলি বেশ চমকপ্রদ। যেমন, বছরে একটি দিন "ডিচ-ডে" বলে একটি জিনিস হয়, শিক্ষকদের আগে থেকে বলে দেয়া থাকে সেদিন কোন ছাত্র-ছাত্রী ক্লাশে আসবে না। দিনটি গোপনীয়, শেষ বর্ষের ছাত্র-ছাত্রী (এখানে তাদের বলা হয় সিনিয়র) ছাড়া আর কেউ জানে না সেটি কবে, তাদের জিজ্ঞেস করলে সব সময়েই তারা বলে থাকে "আগামী কাল"। ডিচ-ডে'র দিনে খুব ভোরবেলা সিনিয়ররা নিজেদের ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে সারা দিনের জন্যে উধাও হয়ে যায়। জটিল ধাঁধার মতো করে রাখা নানা রকম সমস্যা সমাধান করে অন্য সব ছাত্রদের সিনিয়রদের ঘরে ঢুকতে হয়। যারা ঢুকতে পারে তাদের জন্যে ঘরের ভিতরে থাকে নানা রকম পুরস্কারের ব্যবস্থা। পুরস্কার যদি পছন্দ না হয় ছাত্রেরা তখন সিনিয়রদের ঘরে পাল্টা প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা করে রাখে। যেমন, একজন এসে দেখে তার ঘরে বুক-পানি, এবং সেখানে অসংখ্য মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্লাস্টিক দিয়ে ঘরটা ঢেকে সেখানে পানি ঢেলে মাছ ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আরেকজনের ঘরে একটি ব্যাঙকে তরল নাইট্রোজেনে চুবিয়ে মেঝেতে আছড়ে টুকরা টুকরা করে দেয়া হল। এমনিতে ব্যাঙ একটি থলথলে প্রাণী, তরল নাইট্রোজেনে শূন্যের নিচে আশি ডিগ্রি তাপমাত্রায় নিয়ে গেলে সেটি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মুচমুচে চানাচুরের মতো ভঙ্গুর হয়ে যায়, তখন সেটিকে আছড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলা কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। একটি ব্যাঙকে যদি সহস্র টুকরা করে ঘরে ছিটিয়ে দেয়া হয় কারো পক্ষেই সেটা পুরোপুরি পরিষ্কার করা সম্ভব নয় এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তায় সেটি পঁচে একটি বিদঘুটে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করার নিশ্চয়তা দিয়ে দেয়। সবচেয়ে অবাক হয়েছিল আরেকজন ছেলে যখন সে ঘরের দরজা খুলে দেখে

ভিতরে তার গাড়ি, প্রচণ্ড শব্দে তার ইঞ্জিন চলছে। অন্যান্যরা সেটি টুকরা টুকরা করে খুলে ঘরের ভিতরে এনে জুড়ে দিয়েছে।

ডিচ-ডে হচ্ছে ক্যালটেকের কর্মকর্তাদের অনুমোদিত নির্দোষ আমোদের দিন। কর্তকর্তাদের না জানিয়ে যেসব আমোদের ব্যবস্থা করা হয় তার বেশিরভাগই নির্দোষ নয়, কাজেই সেগুলি আরো চমকপ্রদ। স্থানীয় ভাষায় এগুলিকে বলা হয় "প্র্যাংক"। দুর্ভাগ্যক্রমে এটার কোনো ভালো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, কয়েকটা উদাহরণ দিলে এর যথার্থ-মর্ম হয়ত খানিকটা বুঝা যাবে।

একদিন ভোরবেলা এয়ারফোর্সের এক অফিস আবিষ্কার করল তাদের অফিসের সামনে সাজানো ফাইটার প্লেনটা গভীর রাতে উধাও হয়ে গেছে। এটি কোনো খেলনা বা মডেল প্লেন নয়, সত্যিকার প্লেন, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দে সেটিকে সরিয়ে নেয়া শুধুমাত্র ক্যালটেকের ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষেই সম্ভব। ব্যাপারটি নিয়ে অনেক হৈচৈ হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত কর্মকর্তারা হস্তক্ষেপ করে ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করেছিলেন। আরো যেসব জিনিস রাতের অন্ধকারে সরানো হয়েছে তার মাঝে রয়েছে একটি প্রাচীন কামান, এটিও সত্যিকারের কামান এবং ফরাসির কোনো এক যুদ্ধে নাকি এটি সত্যি সত্যি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই কামানটি অনেক টানাটানির পর এখন ক্যালটেকের একটি আবাসিক হলের সামনে শোভা পাচ্ছে। বছরে একদিন সেটিতে জেলো ভরে (জেলো এক ধরনের থলথলে মিষ্টি জাতীয় খাবার) প্রতিপক্ষ হলের উপর সত্যি সত্যি কামান দাগা হয়।

চলচ্চিত্র জগতের নামকরা শহর হলিউড এখান থেকে মাত্র পনের-কুড়ি মাইল দূরে, গত বছর তার শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অনেকরকম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। হলিউড শহরের কর্মকর্তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হঠাৎ একদিন শহরটি নতুন করে দেশব্যাপী খ্যাতি অর্জন করে ফেলল। শহরটির একটি নিজস্ব নিদর্শন আছে, একটি পাহাড়ের উপরে বড় বড় করে লেখা হ-লি-উ-ড। এক একটি অক্ষর প্রায় পয়তাল্লিশ ফুট উঁচু এবং পরিষ্কার দিনে সেটি অনেক দূর থেকে পড়া যায়। হলিউডের শতবার্ষিকী উদযাপনের দিন ভোরে দেখা গেল সেখানে আর হলিউড লেখা নেই, তার বদলে লেখা রয়েছে ক্যা-ল-টে-ক! রাতের অন্ধকারে কয়েকঘণ্টার মাঝে সেই সুরক্ষিত অক্ষরগুলি ক্যালটেকের কয়েকজন ছাত্র মিলে যে কৌশলে পাল্টে দিয়েছিল সেটা এত চমকপ্রদ যে সারা যুক্তরাষ্ট্রের টেলিভিশনের খবরে সেটা ফলাও করে প্রচার করা হয়েছিল!

ক্যালটেকের সবচেয়ে উঁচুদরের প্র্যাঙ্ক করা হয়েছিল ১৯৮৪ সালের নববর্ষের দিনে। সেদিন প্যাসাডিনা শহরে কলেজগুলির সেরা দুটি ফুটবল টিমের মাঝে ফুটবল খেলা হয় (ফুটবল মানে কিন্তু আমাদের ফুটবল নয়, লাউয়ের আকৃতির একটি বলকে কেন্দ্র করে নৃশংস মারপিট সংক্রান্ত একটি ব্যাপার), স্টেডিয়ামের নামানুসারে খেলাটির নাম রোজ বোল এবং এদেশের প্রেসিডেন্টের কাজকর্ম বন্ধ করে এই খেলা দেখার নজির রয়েছে। যাই হোক, সে বছর খেলা চলাকালীন হঠাৎ করে দেখা গেল স্কোরবোর্ডটি যেন হঠাৎ করে নিজের ইচ্ছেমতো ব্যবহার করা শুরু করে দিল। স্কোরবোর্ডে অপ্রাসঙ্গিকভাবে ক্যালটেকের নানারকম গুণগান লেখা

ছাড়াও হঠাৎ করে বিজয়ী দল হিসেবে ক্যালটেকের নাম লেখা হতে শুরু করে। স্টেডিয়ামের কর্মকর্তাদের মাথা খারাপ হবার অবস্থা, অনেক চেষ্টা করেও স্কোরবোর্ডটাকে ঠিক করতে না পেরে তারা পুরো স্কোরবোর্ডই বন্ধ করে দিল। বাকি খেলা শেষ হল কোনো রকম স্কোরবোর্ড ছাড়াই।

ক্যালটেকের যেসব ছাত্র এই অসাধ্য সাধন করেছিল তারা স্টেডিয়ামে ঢোকার জন্যে টিকিট পর্যন্ত জোগাড় করতে পারেনি, দূরে একটি এপার্টমেন্টে বসে রেডিও ওয়েভ ব্যবহার করে স্কোরবোর্ডের নিয়ন্ত্রণটি নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল। স্কোরবোর্ডের ইলেকট্রনিক্সের কিছু পরিবর্তন করার জন্যে আগে অবশ্যি কয়েকবার তাদের বেআইনীভাবে স্টেডিয়ামে ঢুকতে হয়েছিল, তাদের জন্যে সেটি কোনো সমস্যাই নয়!

ক্যালটেকের সবাই ব্যাপারটি সঙ্গত কারণেই একটি চমৎকার কৌতুক হিসেবে গ্রহণ করেছিল, ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একজন প্রফেসর ছাত্রগুলিকে তাদের কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বেশ ভালো গ্রেড পর্যন্ত দিয়ে দিলেন। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর ফউলার তাঁর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্কোরবোর্ডের ছবিটি দেখালেন রীতিমতো অহঙ্কারের সাথে। প্যাসেডিনা শহরের কর্মকর্তারা কিন্তু এই কৌতুকটুকু উপভোগ করতে পারলেন না, বরং চটেমটে ছাত্রদের বিরুদ্ধে একেবারে কোর্টে কেস করে দিলেন। যথাসময়ে মামলা শুরু হল, স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রেরা দোষী সাব্যস্ত হল এবং বিচারপতি নিয়মমাফিক তাদের একটি শাস্তি দিলেন। শাস্তিটিও অভিনব, জেল জরিমানা নয়, ছাত্রদের স্কোরবোর্ডটি এমনভাবে ঠিক করে দিতে হবে যেন ভবিষ্যতে কেউ আর এটাকে এধরনের কাজের জন্যে ব্যবহার করতে না পারে!

এধরনের কাজের উদাহরণ অনেক দেয়া যায়, একটি থেকে আরেকটি আরো মজার, কিন্তু সে চেষ্টা না করে আমি আমার একটি ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতার কথা বলে শেষ করি। আমার একটি কাজের জন্যে একটি ছোট মোটরের প্রয়োজন ছিল, আমি তাই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার হার্ব হেনরিকসনকে জিজ্ঞেস করলাম কোনো অব্যবহৃত মোটর আছে কি না। হার্ব এখানে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে আছে, সে খুঁটিনাটি সব খবর রাখে, আমাকে বলল, হ্যাঁ আছে, চল তোমাকে দিই।

নিচে একটা কেবিনেট খুলে একটা পুরনো যন্ত্র দেখিয়ে বলল, ওখানে লাগানো আছে, খুলে নাও।

আমি খুলতে গিয়ে থেমে গেলাম, যন্ত্রটি বেশ জটিল এবং দেখে মনে হয় একসময় অনেক যত্ন করে তৈরি করা হয়েছিল। কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী তুমি তৈরি করেছিলে?

হ্যাঁ।

কি এটা?

মসবাওয়ার ড্রাইভ।

মসবাওয়ার সাতাশ বৎসর বয়সে ক্যালটেক থেকে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল এবং তার নামানুসারে নিউক্লিয়ার গামা রেজোনেন্সকে মসবাওয়ার এফেক্ট বলা হয়ে

থাকে। মসবাওয়ার ক্যালটেক থাকাকালীন আমার অফিসের পাশের ঘরে বসতেন এবং তাঁর নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পরীক্ষাটি আমাদের ল্যাবরেটরি থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। আমি হার্বকে জিজ্ঞেস করলাম, এটাই কি সেই মসবাওয়ার ড্রাইভ যেটা দিয়ে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আমি কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললাম, তুমি বলছ আমার কাজের জন্যে আমি এখান থেকে একটা মোটর খুলে নেব?

হ্যাঁ।

যেটা দিয়ে মসবাওয়ার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সেটা থেকে?

একটা এক্সপেরিমেন্ট করার পর সেই যন্ত্রের আর কোনো মূল্য নেই, সেটা তখন একটা জঞ্জাল।

আমি মাথা নেড়ে বললাম, তুমি যা ইচ্ছা হয় বলতে পার কিন্তু আমি এখান থেকে আমার নিজের জন্যে একটা মোটর খুলে নিতে পারব না। একটু থেমে বললাম, তবে জিনিসটা একটু ছুঁয়ে দেখতে চাই।

হার্ব হো হো করে হেসে বলল, তোমার যা ইচ্ছা!

আমি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী যন্ত্রটিকে, যেটি এখন অন্যান্য জঞ্জালের সাথে জঞ্জাল হিসেবে পড়ে রয়েছে, একবার স্পর্শ করে দেখলাম।

শুধুমাত্র ক্যালটেকেই সম্ভবত কারো এধরনের অভিজ্ঞতা হতে পারে!

১৯৮৭

মাউন্ট বল্‌ডি

কথা ছিল দিন ভালো থাকলে মাউন্ট বল্‌ডি যাব। মাউন্ট বল্‌ডি দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালার একটা পাহাড়। পাহাড় দেখতে যাওয়া মজার ব্যাপার কিন্তু সেটাতে ওঠার চেষ্টা করলে ব্যাপারটি আর মজার থাকে না, তখন সেটা অনেকটা হয়ে যায় সুখে থাকতে ভূতে কিলানোর মতো! কিন্তু তবু মানুষ জেনে-শুনে সেই ভূতের কিল খেতে যায়, আমরা দোষ করলাম কি? গত রাত রেডিওতে বলেছিল বৃষ্টি হবে, তাই ধরে রেখেছিলাম যাওয়া হবে না। এখানকার আবহাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী খুব ভালো, যদি বলে বৃষ্টি হবে তাহলে সে বৃষ্টি আটকায় তার সাধ্যি কার আছে? কিন্তু বেলা দশটা হয়ে গেল তবু আকাশ পরিষ্কার দেখে মনে হল এবারে এরাও হার মেনে গেল, বৃষ্টি হয়ত সত্যি হবে না। আমি এলবার্টকে ফোন করলাম। এলবার্ট জাতিতে জার্মান, ক্যালটেকের রিসার্চ ফেলো, সে দেশে ফিরে যাচ্ছে বলে তার জায়গায় আমি এসেছি। মোটাসোটা মানুষ, গোলগাল একটা ভুঁড়িও আছে, এই বয়সী মানুষের জন্যে যেটা এখানে খুবই অস্বাভাবিক। দেখতে অনেকটা ঢিলেঢালা কাপড়ের ব্যবসায়ীর মতো কিন্তু ভীষণ কাজের মানুষ, একেবারে ভিতরে একটা চমৎকার মানুষের হৃদয় আছে, পশ্চিম দেশে যার একটু অভাব। আমি ফোন করতেই বলল, চলে এস, মনে হচ্ছে দিনটা ভালোই থাকবে।

কাজেই কিছুক্ষণের মাঝেই দুজনে রওয়ানা দিয়ে দিলাম। জার্মান মানুষ তাই এখানে এসেই একটা ভক্সওয়াগন কিনেছে, পুরনো হয়ে গেছে বলে প্রচণ্ড শব্দ করে কিন্তু এখনো চলছে। মাউন্ট বল্‌ডি প্যাসাডিনা শহর- যেখানে আমরা থাকি তার খুব কাছে পঞ্চাশ থেকে ষাট মাইল দূর হবে, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তা বলে পৌঁছুতে ঘন্টা দুয়েক লেগে যাবার কথা। এলবার্ট আগে এখানে এসেছে। শীতকালে বরফে সব ঢেকে গেলে স্কী করতে আসে, রাস্তাঘাট ভালো চেনে। পাহাড়ি রাস্তায় ঘুরে ঘুরে সে মাউন্ট বল্‌ডির অনেক কাছে চলে এল। এখন নভেম্বর, বেশ গরম, এখনো বরফের চিহ্ন নেই। আমি ভাত খাওয়া বাঙালি, বরফকে খুব ভয় পাই।

গাড়িটা এক জায়গায় রেখে এলবার্ট তার জুতা পাল্টে নিয়ে ভারী হাইকিংয়ের জুতা পরে নেয়। এই জুতার ওজন আমার নিজের ওজনের কাছাকাছি, তাই নেহায়েত বরফ-পানি না থাকলে আমি টেনিস শু পরেই বের হই। এটি পরিষ্কার, শুকনো একটি পাহাড়, পাথরের চাঙ্গ আর ছোটখাট গাছগাছালি ছাড়া বিশেষ কিছু নেই, কাজেই কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়।

আমি আমার র‍্যাক পেকে খাবার-দাবার ভরে নিলাম। র‍্যাক পেকটি বহু ব্যবহারে জীর্ণশীর্ণ কিন্তু মায়া পড়ে গেছে বলে ফেলে দিতে পারি না, পরিচিতেরা

অনেক চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। এলবার্ট তার খাবার-দাবার বের করল, তৃষ্ণা পেলে খাবার জন্যে এলুমিনিয়ামের ক্যানে কোকাকোলা। এই এলুমিনিয়ামের ক্যান দেখলেই আমার একটি ছেলের কথা মনে পড়ে। সেও বাঙালি, দিল্লীর এক হোটেলে তার সাথে পরিচয়, আমি তখন প্রথমবার যুক্তরাষ্ট্রে এসেছি, সে দ্বিতীয়বার। কথাবার্তা শুরু করেই সে বলল, দেখবেন ওখানে ভালো লাগবে না, আমারও ভালো লাগে না। আমার নিজের তাতে খুব সন্দেহ ছিল না, কিন্তু দেশ ছাড়ার পরপরই সেটা শুনে খুব স্বস্তি পেলাম না! কি নিয়ে কোকাকোলার কথা উঠতেই সে বলল, দেখবেন ওখানে এলুমিনিয়ামের ক্যানে কোক বিক্রি হয়। যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছে দেখি, সত্যি তাই। ছেলেটি পেট্রোলের দোকানে কাজ করত, একজন পেট্রোল নিয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যাচ্ছিল বলে সে গাড়ির নাম্বারটি লিখে রেখেছিল। গাড়ির আরোহীদের ব্যাপারটি পছন্দ হল না, তারা ফিরে এসে ছেলেটিকে গুলী করে মেরে ফেলল। বিংশ শতাব্দীর যুক্তরাষ্ট্রে এধরনের অসংখ্য অনুভূতিহীন পিশাচ বাস করে কিন্তু আমাদের অনেকের চোখে বিদেশ মাত্রই স্বর্গরাজ্য, কেউ বিদেশ গেলে তার ছবি পয়সা খরচ করে খবরের কাগজে ছাপানো হয়। এর পর থেকে আমি যখনই কোকাকোলার ক্যান দেখি আমার ছেলেটির কথা মনে পড়ে।

যাই হোক, আমি এলবার্টের জিনিসপত্রও আমার ব্যাক পেকে নিয়ে নিলাম, বেশি কিছু নেই, একটা ব্যাক পেকই যথেষ্ট। পাহাড়ের উপর নাকি চমৎকার হাঁটা রাস্তা চলে গেছে, কাজেই পথ হারানোর কোনো ভয় নেই। আমি তবু কি মনে করে ম্যাপটা নিয়ে নিলাম। দশ হাজার ষাট ফুট উঁচু পাহাড়, গাড়ি করে ইতোমধ্যে পাঁচ হাজার ফুট উঠে এসেছি। শীতকালে স্কী করার জন্যে লোকজন লিফ্‌ট করে আরো হাজার খানেক ফুট উঠতে পারে। সেটা এখনই খুলে দিয়েছে বলে গোড়াতে আরো হাজার খানেক ফুট উঠতে পারব। কাজেই বাকি রাস্তাটুকু জলবত তরলং হওয়ার কথা, এ না হলে কি আর আমি এ রাস্তায় পা বাড়াই ? লোকজনকে যখন গল্প করব তখন কতটুকু নিজে উঠেছি সেটা কি আর খুলে বলব ? উঠেছি, সেটাই হচ্ছে বড় কথা।

আমরা রওয়ানা দিলাম। স্কী লিফ্‌ট এখন একেবারে ফাঁকা, শুকনো পাথুরে পাহাড়ে এখন কে আসবে ? সবকিছু বরফে ঢেকে গেলে এখানে নাকি লাইনে দাঁড়িয়ে লিফটে উঠতে হয়! আমরা টিকিট কিনে ঝুলন্ত চেয়ারে চেপে বসলাম, ঝুলন্ত চেয়ার আমাদের তারের উপর দিয়ে উপরে নিয়ে যেতে থাকে, ভাগ্যিস আমার এক্‌রোফিবিয়া (উচ্চতার ভীতি) নেই, নইলে নিচে শ'দুয়েক ফুট নিচে তাকালে মাথা ঘুরে যেত! বাঙালির মন সন্দেহে ভরা, মনে হতে থাকে তার ছিঁড়ে পড়বে না তো এখান থেকে? যাই হোক, লিফ্‌ট থেকে নেমে আমাদের আসল হাঁটা শুরু হল। আসন্ন শীতের জন্যে প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে, লোকজন কাজ করছে, স্কী করার জন্যে পথ তৈরি করছে, গাছ কাটছে, ঢালু সমান করছে! একজন আমাদের দেখে চেঁচিয়ে কি যেন বলল, কথাটা ইংরেজি নয় বলে আমি কিছু বুঝতে পারলাম না। আলবার্ট বুঝল, সে উত্তর দিল জার্মান ভাষায়! আমি অবাক হয়ে বললাম, বুঝল কেমন করে তুমি জার্মান ?

আমার এই পোশাক দেখে, এটা আমাদের পাহাড়ে উঠার পোশাক। পোশাকটা একটু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, ঢোলা প্যান্ট হাঁটুর কাছে চাপা হয়ে গেছে, উলের মোজা সেটাকে

ঢেকে রেখেছে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত, আমি আগেও কাউকে কাউকে দেখেছি এটা পরতে, কিন্তু জানতাম না এটা ওদের দেশীয় পোশাক! আমাকে কেউ হাজার টাকা দিয়েও এটা পরতে রাজি করাতে পারবে না!

মাউন্ট বল্‌ডির প্রথম অংশটি দেখে আমার একটু আশাভঙ্গ হল। আমি নেহায়েত ভাত-খাওয়া মধ্যবিত্ত বাঙালি। এদেশের ঐশ্বর্য-সম্পদ ভোগবিলাস আমাকে মোহগ্রস্ত করে না কিন্তু এদের বিস্তীর্ণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমাকে হিংসাতুর করে তোলে। এখানে পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি, হ্রদ, আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত সবকিছু রয়েছে, সবচেয়ে বড় কথা, একটু কষ্ট করলেই এমন অঞ্চলে যাওয়া সম্ভব যেখানে সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। মানুষজন নেই, জনমানবহীন বিস্তীর্ণ আদিম প্রকৃতি, লক্ষ লক্ষ বছর থেকে একভাবে রয়ে গেছে। এদেশে এটাই আমার একমাত্র আকর্ষণ। তাই মাউন্ট বল্‌ডির শুরুটুকু দেখে আমার খুব আশাভঙ্গ হল। প্রচণ্ড চওড়া খোয়া বাঁধানো রাস্তা উপরে উঠে গেছে, দেখে মনে হয় দুবেলা সৈন্যসামন্ত এই রাস্তা দিয়ে ট্যাংক নিয়ে উঠে যায়। শুকনো পাথর, রুক্ষ প্রকৃতি, গাছগাছালি নেই, ধূসর বুনো ঘাস। নভেম্বর মাস কিন্তু গনগনে রোদ, প্রচণ্ড গরম, তাই আমি সোয়েটার খুলে ব্যাক পেকে ভরে নিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে একটু পরেই কিন্তু চারদিক পাল্টে গেল। নির্জন পাহাড়ি এলাকা, যেদিকে তাকাই পর্বতমালা ছড়িয়ে আছে। দূরে ধু-ধু মহাবী মরুভূমি, পরিষ্কার দিন, শ'খানেক মাইল স্পষ্ট দেখা যায়। গাছপালা বেশি নেই, শুকনো পাথর আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়। বাংলাদেশে ঘন সবুজ দেখে অভ্যাস, ধূসর বিবর্ণ গাছপালা আলাদা করে দেখলে চোখকে পীড়া দেয় কিন্তু সবটুকু মিলিয়ে তাকালে তার মাঝেই একটা অন্য ধরনের সৌন্দর্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুজনে চড়াই-উৎরাই পার হয়ে যাচ্ছি কিন্তু একটু পরে লক্ষ্য করলাম এলবার্ট পিছিয়ে পড়ছে। মোটা মানুষ, দীর্ঘদিন ঘরে বসে কাজ করেছে, শারীরিক পরিশ্রম করেনি বলে ঠিক জুত করতে পারছিল না। আমি শুকনো মানুষ, বরাবরই হাঁটাহাঁটি করে অভ্যাস, কাজেই সেরকম কোনো অসুবিধে হচ্ছিল না, একটু পরে পরেই দাঁড়িয়ে ওর জন্যে অপেক্ষা করি। শুরু করার দশ মিনিটের মাঝে সে তার ভাগের কোল্ড ড্রিংক খেয়ে তৃষ্ণা মিটিয়ে নেয়। ঘেমে সে নেয়ে উঠেছে, আমাকে বলল তার জন্যে অপেক্ষা না করে এগিয়ে যেতে, চূড়ায় গিয়ে দেখা হবে। আমি তবু তার সাথে সাথেই হাঁটতে থাকি।

যারা পাহাড়ে উঠেছে বা পাহাড়ি এলাকার সাথে পরিচিত তারা নিশ্চয়ই জানে যে, উপরে বাতাসের ঘনত্ব কম বলে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণও অনেক কম। অক্সিজেনের অভাবে মানুষ পাহাড়ের উপরে খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে যায়। নিচে এক হাজার ফুট উপরে উঠতে যত কষ্ট, পাহাড়ের উপরে সেই একই উচ্চতায় উঠা তার থেকে অনেক বেশি কষ্ট। এ জন্যেই মাউন্ট এভারেস্টে উঠতে হলে সবাই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে রওয়ানা দেয়! মেসনার নামে একজন পর্বতারোহী অবশ্যি একমাত্র ব্যতিক্রম! সে একা কোনো রকম অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টে উঠে গিয়েছিল, অবশ্যি মেসনারের মতো শারীরিক ক্ষমতা আর কতজনের আছে ? সেই

মুহূর্তে এলবার্ট তার নাম পর্যন্ত শুনতে চাইছিল না, অক্সিজেনের অভাব তাকে একেবারে কাবু করে ফেলেছে। আমি শুকনো-পাতলা মানুষ বলে আমার হয়ত অক্সিজেনও লাগে কম! পায়ে হালকা জুতো বলে আমার উঠতেও অনেক সুবিধে।

মাঝামাঝি এসে এলবার্ট আমার কাছ থেকে ব্যাক পেক নিয়ে নিল, দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নেয়ার কথা, তাই। আমি নিষেধ করলাম কিন্তু সে শুনল না। লাভের মাঝে লাভ হল, সে আরো পিছিয়ে পড়তে থাকে। আমি তখন একা একাই এগিয়ে গেলাম।

নির্জন পাহাড়ে একাকীত্ব একটা অদ্ভুত অনুভূতি। পাহাড়ে এঁকেবেঁকে পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে, কোথাও সরু রাস্তা দুদিকে ঢালু নেমে গেছে কয়েক হাজার ফুট। একটু পা ফসকালেই থামার উপায় নেই। পা কিন্তু আসলে কখনোই ফসকায় না, পথ যখন বিপজ্জনক হয় মানুষ তখন অনেক সাবধানে পা ফেলে! স্বপ্নে কখনো কখনো দেখা যায় পিছলে পড়ে যাচ্ছি, যেটা ধরছি ছুটে যাচ্ছে, যেখানে পা রাখছি পিছলে যাচ্ছে, সে একটা জঘন্য অনুভূতি! সত্যিকার সেরকম অনুভূতির কোনো প্রয়োজন নেই, কাউকে বলার জন্যও ফিরেও আসা যাবে না! পাহাড়ি পথ অনেক বিচিত্র, কখনো উঠে যাচ্ছে, কখনো নেমে যাচ্ছে, কখনো আবার পথ শেষ, পাথর খামচে খামচে খানিকটা উঠে যেতে হবে। কোথাও দু'পাশে পাহাড়, মাঝখানে সরু ক্যানিওন, বাতাস সেখানে তীব্রতর, শন শন শব্দ করে বইছে, মনে হয় বুঝি কালবৈশাখীর ঝড়, পারলে বুঝি উড়িয়ে নেবে। বাতাস কিংবা তরলকে যদি হঠাৎ করে একটা সরু জায়গা দিয়ে যেতে বাধ্য করা হয় তাহলে সেখানে বাতাস বা তরলের গতিবেগ অনেক বেড়ে যায়। উইন্ড টানেলে এভবে বাতাসের গতিবেগ বাড়িয়ে পাঁচ-ছয়শ মাইল পর্যন্ত করা হয় বিমান বা গাড়ির উপর পরীক্ষা করার জন্যে। আমি একবার নির্বোধের মতো এরকম একটা জায়গায় পা দিয়েছিলাম, যখন আমি খেয়াল করেছি তখন বাতাস আমাকে উড়িয়ে নিচ্ছে। একজন নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে ধরে ফেলেছিল বলে আমি বাতাসে উড়ে যাইনি এবং এখন সে গল্পটা করতে পারছি! যে এক মুহূর্তের জন্যে উড়ে যাচ্ছিলাম সে অনুভূতিটা আমার বেশ মনে আছে, এক কথায় সেটিকে বলা যায় অপূর্ব।

যতই উপরে উঠতে থাকি তাপমাত্রা ততই কমতে থাকে। হঠাৎ এক জায়গায় দেখি বরফ পড়ে আছে। কয়দিন আগে বরফ পড়েছিল, এখনো যখন গলে শেষ হয়নি তাপমাত্রা তাহলে নিশ্চয়ই শূন্যের কাছাকাছি। সাথে সাথে আমার শীত করতে থাকে, বাঙালির রক্ত বরফ সহ্য করতে পারে না। সোয়েটার খুলে রেখেছিলাম ব্যাক পেকে, সেটা এখন এলবার্টের পিঠে, কাজেই ওর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। বাতাসে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, তাই একটা পাথরের আড়ালে রোদের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকি। রোদটা ভারি আরামের, দেশের শীতের দুপুরের কথা মনে পড়ে যায়। উপরে বাতাসের ঘনত্ব কম বলে আলট্রাভায়োলেট রে অনেক বেশি, মানুষ তাই রোদে পুড়ে যায় সহজে। দেশে রোদে রোদে ঘুরে মানুষজনের যে অবস্থা হয় এটি সে রকম নয়, তার থেকে অনেক খারাপ। বিশেষ করে বরফের উপরে হলে তো কথাই নেই, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে খুব

খারাপ অবস্থা করে দেয়। আমরা, যাদের চামড়া সাদা নয় তারা অনেক বেশি রোদ সহ্য করতে পারি। মনে আছে, একবার একই জায়গা থেকে ঘুরে আসার পর আমার যেখানে কিছুই হয়নি সেখানে একজন আমেরিকান ছেলের সারা হাত পা মুখ পুড়ে জ্বলে গিয়েছিল। আমার সাথে যখন দুদিন পরে দেখা হয়েছে তখন তার চামড়া খসে পড়ছে, হলুদ রঙের কি বের হচ্ছে সেখান থেকে, এক নজর তার দিকে তাকালে দুবেলা ভাত খাওয়া যায় না। আমি তাকে বুঝালাম, বাঁদর থেকে মানুষ হয়ে আমরা অনেকদূর এগিয়ে এসেছি বলে আমাদের কিছু হয় না। সাদা চামড়ার লোকজন নিশ্চয়ই অল্প কিছুদিন হল বাঁদর থেকে মানুষ হচ্ছে, তাই এই অবস্থা! ব্যাখ্যাটি খুব পছন্দ হয়নি, বলাই বাহুল্য, কিন্তু তার বলার কিছু ছিল না!

এলবার্ট হাজির হল একটু পরেই, বেচারার মুখ-চোখ লাল হয়ে গেছে। বলল, পাতলা বাতাস একেবারে কাবু করে ফেলেছে।

আমি সাহস দিলাম, এই তো এসে গেছি!

আসলেই প্রায় এসে গেছি। চূড়া দেখা যাচ্ছে। দুজন নেমে আসছিল, তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তারাও বলল আর বড়জোর আধঘন্টার রাস্তা। শেষ অংশটুকু অবশ্যি বেশ খাড়া, পাথর ধরে ধরে উঠতে হয়। অল্পতেই দম ফুরিয়ে যায় বলে তাড়াহুড়ো করে লাভ নেই, না থেমে আস্তে আস্তে মোটামুটি একটা গতিতে উপরে উঠতে থাকি। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে, উপরে উঠে কি আরাম করে খাব চিন্তা করেই আনন্দ হচ্ছে!

মাউন্ট বন্ডির চূড়াটা বেশ সমতল, অনেকটা একটা ছোট ফুটবল মাঠের মতো। একটা তামার ফলকে পাহাড়ের নাম আর উচ্চতা লেখা- দশ হাজার ষাট ফুট! বরফের ভিতর দিয়ে একবার আরেক পাহাড় মাউন্ট রেইনিয়ারের দশ হাজার ফুট উঠে দেখি সেখানে সারি সারি বাথরুম! যারা পাহাড়ের চূড়ায় (চৌদ্দ হাজার ফুট) উঠে তারা এখানে রাত কাটায়, প্রাকৃতিক কর্মের জন্যে সুবন্দোবস্ত রয়েছে। হেলিকপ্টার দিয়ে মাঝে মাঝে সেগুলি পরিষ্কার করা হয়। আমরা যখন গিয়েছি তখন নিশ্চয়ই হেলিকপ্টার আসার সময় হয়ে এসেছে, কারণ দুর্গন্ধে বাতাস ভারী হয়েছিল! এখানে সেরকম কিছু নেই দেখে স্বস্তি পেলাম। এক পাশে কিছু পাথর চাপা দেয়া একটা উজ্জ্বল লাল রঙের কৌটা, ভিতরে একটা নোট বই আর একটা পেন্সিল, যারা নিজেদের নাম লিখে অমর হয়ে আসতে চায় তাদের জন্যে। আমি এই সুযোগ হারালাম না। বড় বড় করে নিজের নাম লিখে অমর হয়ে গেলাম!

একটু পরে এলবার্ট এসে হাজির হয়, দুজনে মিলে খানিকক্ষণ চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখি। অঞ্চলটায় একটা বড় ভূমিকম্প হবার কথা (আমি জানি, আমার যা কপাল আমি এখানে থাকতে থাকতেই সেটি হবে!)। আশপাশে পাহাড়ের অনেক কিছু দেখে সেটি নাকি বলা সম্ভব। এখানে কোনো একটা পাহাড়ের উচ্চতা নাকি ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে, এলবার্ট এধরনের অনেক কিছু জানে, উৎসাহ নিয়ে আমাকে সেগুলি বলতে থাকে।

খানিকক্ষণ কথা বলে আমরা খেতে বসি। ব্যাক পেক খুলে দেখি এলবার্টের খাবার নেই, বললাম, সে কি, তুমি রাখনি ?

এলবার্ট মাথা চুলকে বলল, আমি ভেবেছি তুমি রেখেছ।

দুটো কলা ছিল, খেতলে আঠার মতো হয়ে গেছে। এখন সেটাই খেতে হবে! একজনের খাবার দুজনে ভাগাভাগি করে খেয়ে খিদেটা যেন একটু বেড়ে গেল। তখনো জানতাম না আমাদের আসন্ন দুর্গতির সেটা মাত্র শুরু!

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমরা ঠিক করলাম এখন নামা শুরু করা উচিত। এলবার্ট বলল, যে পথে এসেছি সে পথে না নেমে অন্য এক দিক দিয়ে নামা যাক। সে ম্যাপ খুলে অন্য পথটি দেখাল, আমি সানন্দে রাজি হলাম। যে পথে এসেছি সে পথে ফিরে যাওয়া ব্যাপারটি একটু বিরক্তিকর।

এলবার্ট ম্যাপ দেখে পথটা বের করে নেয়, সরু একটা পায়ে চলা পথ পাহাড়কে ঘিরে নেমে গেছে। এখানকার এই ম্যাপগুলি চমৎকার। শুধু যে পাহাড়-পর্বতের ম্যাপ তা নয়, বড় বড় শহরের আশ্চর্য সূক্ষ্ম ম্যাপ রয়েছে। হাজার হাজার রাস্তাঘাটের গোলকধাঁধা থেকে ঠিক রাস্তা বা ঠিক জায়গা খুঁজে বের করতে এই ম্যাপগুলির মতো উপকারী জিনিস আর কিছুই নেই। আমি প্রথম যখন এদেশে আসি তখন ম্যাপের কথা জানতাম না বলে কোথাও হারিয়ে গেলে উদভ্রান্তের মতো এদিকে সেদিকে হাঁটতে থাকতাম যতক্ষণ না একটা পরিচিত রাস্তা চোখে পড়ত। অনেকটা সেই সেক্রেটারীর মতো, যে একদিন খুশিতে চিৎকার করে উঠে বলেছিল, কী আশ্চর্য! ডিকশনারীতে শব্দগুলি অক্ষর অনুযায়ী সাজানো, আমি এতদিন এমনি খুঁজেছি!

যাই হোক, আমরা নামা শুরু করি। এ পথটি আগের থেকে অনেক সুন্দর। পাহাড়ি রাস্তা, ছোটখাট ঝোপঝাড় আর পাথর ছাড়াও অনেক গাছপালা আছে। রাস্তাটা আগের থেকে অনেক বেশি বিপদসংকুল, অনেক বেশি খাড়া, উঠার সময় আমি যেরকম তর তর করে উঠে এসেছিলাম এবারে এলবার্ট সেরকম তর তর করে নামতে থাকে। ছোটখাট পাথরের টুকরায় পা ঠিকমতো না ফেললে পিছলে যাবার ভয়। তার পায়ে ভারী হাইকিং-এর জুতা, যেখানে পা ফেলে সেখানেই পা আটকে যায়। আমার পায়ে হালকা টেনিস শু, পা হড়কে যেতে চায় সহজেই। নিজের জানের উপর অনেক মায়া, তাই ঝুঁকি না নিয়ে আস্তে আস্তে নেমে আসছি, এলবার্ট খানিকদূর এগিয়ে গিয়ে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি আস্তে আস্তে নেমে আসি।

জায়গাটি অপূর্ব সুন্দর। উঁচু-নিচু পাহাড়ের মাঝে পথ এঁকেবেঁকে নেমে গেছে। কোথাও ঢালু পাহাড় প্রায় ৪৫° কোণ করে আছে, তার মাঝে আড়াআড়ি পথ, পা পিছলে গেলে গড়িয়ে যেতে হবে কয়েক শ' ফুট। পথে ছোট ছোট নুড়ি। একটা পা ফেলে সেটা ঠিকমতো বসেছে কি না দেখে অন্য পা-টা তুলে আনতে হয়। মাঝে মাঝেই নিচু হয়ে ভরকেন্দ্রের মাটির কাছাকাছি নিয়ে এসে আরো সাবধান হয়ে নিচ্ছিলাম। এখানে-সেখানে বড় বড় পাইন গাছ বিকেলের বাতাসে ঝিরঝির করে নড়ছে। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, এখন শীতের শুরু বলে সাপের ভয় নেই। এছাড়া এখানে নাকি ভীষণ র‍্যাটেল সপের উপদ্রব। র‍্যাটেল সাপের ল্যাজে ঝুনঝুনির মতো একটা জিনিস থাকে যেটা নাড়িয়ে শব্দ করে বলে এর নাম র‍্যাটেল সাপ। সাপটি বিষাক্ত কিন্তু আমাদের দেশের সাপের মতো নয়। নেহায়েত খুব দুর্বল মানুষ হলে র‍্যাটেল সাপের কাপড়ে মারা যায়। এমনিতে এই সাপের বিষ খুব যন্ত্রণাদায়ক, তাছাড়া বিষে কি একটা জিনিস রয়েছে যেটা নাকি মাংসকে গলিয়ে ফেলে একটা

বিচ্ছিরি অবস্থা করে! আপাতত সেই ভয় নেই, আর থাকলেও আমার ভয় কি, আমি এলবার্টের পিছনে পিছনে যাচ্ছি! সারা রাস্তায় আমি আর এলবার্ট ছাড়া আর কেউ নেই। কী সাংঘাতিক নির্জন এলাকা না দেখলে অনুভব করা যায় না। রাতে নিশ্চয়ই এসব এলাকায় ভূত-পেত্নীর মিটিং বসে।

অনেকক্ষণ একটানা নিচে নেমে এসেছি, ঘড়ি দেখে একটু অবাক হয়ে গেলাম, এর মাঝে এক ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। যে পথ উঠতে দু ঘণ্টা লাগে সেটা নামতে কিছুতেই এক ঘণ্টার বেশি লাগার কথা না, অথচ আমরা এখনো অর্ধেক রাস্তাও নেমে আসিনি, কারণ অর্ধেক রাস্তা নামার পর একটা কী লজ পাবার কথা। লজের এখনো কোনো দেখা নেই। আমি এলবার্টকে আমার সন্দেহের কথা বললাম, সে খানিকক্ষণ ম্যাপটা গম্ভীর হয়ে দেখে বলল, না ঠিকই আছে, এই তো আমরা এই পাহাড়টা পার হয়ে এসেছি। এখন দেখ, সামনে গিয়ে রাস্তাটা বাম দিকে মোড় নেবে আর তক্ষুনি দেখবে লজটা।

আমি তার কথা মেনে নিয়ে হাঁটতে থাকি। এলবার্টের ঠাট্টা করার জন্যেই মনে হল রাস্তাটা বাম দিকে মোড় না নিয়ে ডান দিকে মোড় নিল। আমরা দুজনেই ব্যাপারটা না দেখার ভান করে আরো আধঘণ্টা হেঁটে গেলাম, তখনো লজের দেখা নেই। আমি আবার দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, নাহ! কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। আমাদের উঠতে লেগেছে দুঘণ্টা, অথচ দেড়ঘণ্টা ধরে নামছি, এখনো অর্ধেক নামতে পারিনি এটা কিছুতেই ঠিক হতে পারে না।

এলবার্ট মাথা চুলকে এবারে প্রশ্নের উত্তর দেয়া শুরু করল, কিন্তু এটা কি একমাত্র পথ না? আর কোন পথ কী দেখছ?

আমি স্বীকার করলাম আর কোন পথ দেখিনি, কাজেই এটাই সেই পথ, এটা ধরে হাঁটতে থাকলে আমরা পৌঁছে যাব। কে জানে হয়ত লজটা ঝড়ে উড়ে গেছে, পাহাড়-পর্বতের ব্যাপার, কে বলতে পারে!

আমরা আবার হাঁটতে শুরু করি, পাকা আধঘণ্টা খাড়া নেমে যাচ্ছি, কিন্তু কোথায় কি! আমাদের যাওয়ার কথা পূর্ব দিকে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমরা যাচ্ছি উত্তর দিকে। আমার দিকজ্ঞান খুব খারাপ, সাথে কম্পাস নেই কিন্তু সূর্য তো আর ভুল করে না। আমি আবার এলবার্টকে দাঁড় করালাম, খুতখুতে বুড়োর মতো ব্যবহার করতে খারাপ লাগছিল কিন্তু পথ হারিয়ে এখানে পড়ে থাকারও তো কোনো মানে হয় না। এলবার্ট আবার মাথা চুলকে বলল, কিন্তু একটাই তো পথ, সেটা আবার হারাব কীভাবে?

আমি প্রথমবার ম্যাপটা নিজে দেখলাম। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই আমার চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ম্যাউন্ট বলডির উপর থেকে আমাদের যে পথে যাওয়ার কথা সেটা ছাড়াও আরো একটা ফিনফিনে পথ একেবারে উল্টোদিকে চলে গেছে! সুদীর্ঘ পথ সেটি! খাড়া নেমে গেছে উত্তরে, পাহাড়ের একেবারে গোড়ার দিকে। পনের-কুড়ি মাইলের কম না, বহুদূরে গিয়ে গাড়ির রাস্তায় মিশেছে। তবে কি আমরা এই পথ দিয়ে যাচ্ছি? আমি এলবার্টকে দেখালাম, সে মাথা নেড়ে জোর গলায় বলল, না, এটা কিছুতেই হতে পারে না।

আমি তার দিকে তাকাতেই সে আবার ম্যাপের দিকে তাকায়। খানিকক্ষণ ম্যাপের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে মুখ তুলল, ওর মুখ পাংশু বর্ণ হয়ে গেছে, সাদা চামড়ায় পাংশুবর্ণ একটু অন্যরকম, ফ্যাকাসে সাদার মতো! হাসিখুশি মানুষ হঠাৎ মনমরা হয়ে গেলে দেখে খুব কষ্ট হয়, আমারও এলবার্টের জন্য একটু কষ্ট হল। বন্যায় গাছের মগডালে পানি পৌঁছে গেলে কাকেরা কোথায় থাকবে সেটা নিয়ে শেয়ালের যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট! এলবার্ট আস্তে আস্তে সাধু ভাষায় বলল, বন্ধু, আমি আশংকা করিতেছি তুমি যথার্থই ধরিয়াছ! আমরা সম্পূর্ণ উল্টা পথে যাইতেছি।

আমরা দুজন একটা পাথরের উপর বসে খানিকক্ষণ হেসে নিলাম, নিজেদের নির্বুদ্ধিতায় নিজেরা হেসে খুব সুখ নেই কিন্তু না হেসেই-বা কি লাভ! একটু চিন্তা করে দেখলাম কোনো সত্যিকার বিপদের আশংকা আছে কি না। যদি আবহাওয়া খারাপ হতো কিংবা বেলা ডুবে যেত তাহলে বিপদের আশংকা ছিল। এই পথটা খুব কম মানুষ ব্যবহার করে বলে খুব সহজেই হারিয়ে ফেলা সম্ভব। এলবার্ট অভিজ্ঞ মানুষ বলে খুঁজে বের করতে পারে, আমি একা হলে কখনো পারতাম না। সাথে কোনোরকম টর্চলাইট নেই বলে অন্ধকার হয়ে গেলে এলবার্টও পারবে না। কাজেই আমরা যদি দিনের আলো থাকতে থাকতে পৌঁছে যেতে পারি, কোনো ঝামেলা হবার কথা নয়। বেলা ডুবতে খুব বেশি দেরি নেই, কাজেই আমাদের খুব তাড়াতাড়ি নেমে যেতে হবে। ফিরে গিয়ে আবার আগের রাস্তায় যাওয়ার এখন প্রশ্নই আসে না। যে পথটুকু এসেছি সেটা উঠতে সারা রাত লেগে যাবে! এই উল্টো পথে যেখানে পৌঁছাব সেটা যদি লোকালয়ের কাছে হয় কেউ হয়ত দয়া করে আমাদের গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেবে। সেটা নিয়ে এখন আমি আর মাথা ঘামাচ্ছি না। পথ হারিয়ে এই পাহাড়ে থেকে যেতে আমি রাজি নই, সাপখোপ বা বন্য জন্তুতে আমরা ভয় নেই, এমনকি ভূত-প্রেতের সাথেও আমি রাত কাটাতে রাজি, কিন্তু রাতে পাহাড় এত দ্রুত ঠাণ্ডা হয়ে যায় যা বলার মতো নয়। গরম কাপড় দূরে থাকুক, আমাদের কাছে আগুন জ্বালানোর জন্যে একটা ম্যাচ পর্যন্ত নেই!

সময় নষ্ট না করে আমরা আবার নামা শুরু করলাম। এবারে আর হাঁটা নয়, যাকে বলে ছোটা সত্যি সত্যি পাহাড়ি ছাগলের মতো এক পাথর থেকে আরেক পাথরের উপর লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছি! সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সূর্য ডুবে যাওয়ার আগে পৌঁছাতে হবে। নির্জন পাহাড়ে দুজন ছুটে নেমে আসছে দৃশ্যটি নিশ্চয়ই দর্শনীয় ছিল, কিন্তু দেখার জন্যে কেউ নেই। পাহাড়ে ছোটা একটু বিপজ্জনকও, বেশি ঢালু হলে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকে না, কিন্তু প্রয়োজনে মানুষের ক্ষমতাও বাড়ে-কমে!

ধীরে ধীরে পাহাড় ঘন জঙ্গলে ঢেকে গেল, এতক্ষণ শুকনো পাথর ছিল এখন ভেজা স্যাঁতস্যাতে জঙ্গল। আস্তে আস্তে একটা পানির ধারার শব্দ শুনতে পেলাম, ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, শেষ কোকাকোলাটি আধঘণ্টা আগে শেষ করে ফেলেছি. এখন ওটার কাছে পৌঁছালে হয়। সাথে খাবার না থাকলে খিদে বেশি লাগে, তেমনি সাথে তৃষ্ণা মেটানোর কিছু নেই বলে তৃষ্ণাও বেশি লাগছে। অনেকটা ছেলেবেলায় রোজা রাখার মতো, এমনি বেলা দশটার আগে কিছুতেই নাস্তা করতে পারি না কিন্তু যেদিন রোজা থাকি শেষরাতে ভরপেট

খেয়েও ভোরে ঘুম থেকে উঠেই কি প্রচণ্ড খিদে! এবারেও তাই, পানির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম কিন্তু পানির আসার শুধু শব্দই শুনি, কখনো কাছে কখনো দূরে কিন্তু নাগাল আর পাই না। শেষ পর্যন্ত প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে পানির ধারার কাছে হাজির হলাম। ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে ঢক ঢক করে পানি খেয়ে বুকটা জুড়িয়ে নিলাম। এখানকার পানি খাওয়া নিষেধ। কিন্তু ছাত্র জীবনে হোস্টেলে ডাল খেয়ে বড় হয়েছি, এখনো লোহা খেয়ে হজম করে ফেলতে পারি। আমার ভয় কি ?

একটু বিশ্রাম করতে পারলে হত, কিন্তু সময় নেই, তাই আবার ছুটে চললাম।

হঠাৎ এক জায়গায় এসে দেখি দূরে রাস্তা দেখা যাচ্ছে, আমাদের শেষ পর্যন্ত এই রাস্তায় উঠতে হবে। চেনা কিছু দেখলে বুকে বল পাওয়া যায়, আমরা দুজনেই সাহস ফিরে পেলাম। এলবার্টের ভিতরে নিশ্চয়ই বাঙালি রক্ত আছে, বলল, চল পথ ছেড়ে দিয়ে ঐ পাহাড়ের মাঝে শর্টকাট মেরে রাস্তায় উঠে পড়ি। আমি রাজি হলাম না, কোথায় জানি পড়েছিলাম, কখনো পথ ছেড়ে যেয়ো না। সহজ একটা পথ বন-জঙ্গলে একটা কঠিন গোলকধাঁধা হয়ে যেতে পারে। জানের মায়া ওর থেকে আমার বেশি, ওকে বুঝিয়ে রাজি করিয়ে আবার দুজনে ছোটা শুরু করি, দেখতে দেখতে রাস্তাটা পাহাড়ের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর সূর্য ডুবে গেল। অন্ধকার হয়ে আসছে দ্রুত, কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো, পথটা আস্তে আস্তে অনেক চওড়া হয়ে এসেছে, এখন আর পথ হারানোর ভয় নেই, দরকার পড়লে অন্ধকারেও হাতড়ে হাতড়ে যাওয়া সম্ভব। আমি সাবধানে মাটিতে তাকিয়ে মানুষের পায়ের ছাপ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। খানিকক্ষণ খুঁজে সত্যি সত্যি মানুষের পায়ের ছাপ থেকেও ভালো জিনিস পেয়ে গেলাম। কে একজন গাছের নিচে বাথরুম করে গেছে! আমি এলবার্টকে দেখালাম, দেখ, কেউ একজন এক্ষুনি এদিক দিয়ে গেছে, তার মানে লোকালয় পেতে আর দেরি নেই।

সত্যি তাই, একটু হেঁটেই দেখি দূরে বাড়িঘর দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। আমরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। কিন্তু মজার তখনো শেষ হয়নি। আমরা যতই হাঁটি জায়গাটা আরো পিছিয়ে যায়। সেই এলাকাটাতে পৌঁছাতে আরো একঘণ্টা লেগে গেল। জায়গাটা ছোট একটা শহরের মতো, দোকানপাট ছাড়াও হোটেল-মোটেলও আছে।

রাস্তার পাশে দুজন পা ছড়িয়ে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। আমরা একেবারে পাহাড়ের গোড়ায় চলে এসেছি, গাড়ি এখান থেকে পাঁচ-ছয় হাজার ফুট উপরে, দশ থেকে পনের মাইল রাস্তা। কিভাবে যাব এখনো জানি না, আশা করে আছি কেউ একজন নিয়ে যাবে।

দুজন বুড়ো আঙুল বের করে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম, যার অর্থ আমাদের কেউ একজন পৌঁছে দেবে ? দেশে হলে কাঁচকলা দেখানোর জন্যে মার খাওয়ার আশংকা ছিল, এখানে এটাই নিয়ম। কিন্তু আমরা যেদিকে যেতে চাচ্ছি সেদিকে গাড়ি যাচ্ছে খুব কম। বেশির ভাগই এখন পাহাড় থেকে নেমে আসছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল তবু কেউ আমাদের জন্যে গাড়ি থামায় না। আমি শুকনো মানুষ, আমাকে

দেখে ভয় পাবার কিছু নেই কিন্তু এলবার্ট গাট্টাগোট্টা মানুষ, তাকে দেখে লোকজন ভয় পেলে অবাক হবার কিছু নেই। পুলিশ এখানে সব সময় বলতে থাকে, খবরদার, অপরিচিত কাউকে রাস্তা থেকে তুলো না। তবু যারা রাস্তা থেকে লোকজনকে তুলে নেয় তারা সেরকম লোক। আমার পরিচিত একজন একবার এভাবে একজনের গাড়িতে উঠে আবিষ্কার করল লোকটা খ্যাপা! পকেট থেকে একটা রিভলবার বের করে সে মাইলপোস্টে গুলি করে আর হা হা করে হাসতে থাকে আনন্দে!

এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিলেন, আমাদের দেখে দাঁড়ালেন, কী ব্যাপার জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা মাত্র, আমরা আমাদের সুদীর্ঘ দুঃখের কাহিনী বলে ফেলে তাদের হৃদয় দ্রবীভূত করে ফেললাম। তারা বলল যে তাদের একটা ছোট ট্রাক আছে, আমরা যদি পিছনে বসে যেতে রাজি থাকি আমাদের নিয়ে যেতে পারে। আমরা লাফিয়ে রাজি হলাম। ট্রাক তো ভালো জিনিস, কেউ যদি বলে বাঘের পিঠে বসে যেতে হবে, এখন আমরা তাতেও রাজি!

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে। আমরা ট্রাকের পিছনে বসে আছি, বাতাস পারলে উড়িয়ে নিতে চায়। গুটিশুটি মেরে শরীর কোনোমতে গরম করে রেখেছি। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা সাপের মতো উঠে গেছে, দূরে আকাশ তখনো লাল হয়ে আছে। সরু একটা চাঁদ উঠেছে আকাশে, একই চাঁদ দেশে যেটাকে দেখে এসেছি। চারদিকে থমথমে নিস্তব্ধ পাহাড়, তার মাঝে একটা ট্রাক প্রচণ্ড শব্দ করে ছুটে যাচ্ছে! দেখে-শুনে আমার একটা আশ্চর্য অনুভূতি হল, কোথায় কোন দূর দেশে জন্ম হয়েছে, বড় হয়েছি অথচ এখন এক নির্জন পাহাড়ে অচেনা একজনের ট্রাকের পিছনে গুটিশুটি মেরে বসে আছি আরেকজন বিদেশীর সাথে। কী আশ্চর্য!

যারা আমাদের পৌঁছে দিল আমরা তাদের খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলাম। আমি যখন বসে বসে কোকাকোলা খাই অন্যেরা তখন বোতলের পর বোতল মদ শেষ করে, দেখেই আমার নেশা হয়ে গেল। যখন ছোট ছিলাম এক বন্ধু খবর এনেছিল যে, সে একজন মানুষকে চিনে যে নাকি মদ খায়। আমরা দলবল মিলে কয়েক মাইল হেঁটে সেই লোকটিকে দেখতে গিয়েছিলাম। আগে জানলে ছেলেবেলায় হাঁটার কষ্ট করতে হত না। খেতে খেতে গল্প হচ্ছিল, বেশির ভাগ গল্পে আমি সুবিধা করতে পারি না, স্ত্রী করার গল্প, রোদে শরীর বাদামী করার গল্প, মদের গল্প, গাড়ির গল্প, টাকার গল্প! ঘুরে-ফিরে যেই রাজনীতির গল্প উঠল, আমাকে আর পায় কে, এর পরে ওরা আর জুত করতে পারল না!

পরের দুদিন আমার আর এলবার্টের অবস্থা দেখার মতো, দুজনে পা লম্বা করে আস্তে আস্তে খুঁড়িয়ে হাঁটি, যে-ই দেখে সে-ই ভাবে- কী হল এই দুই জনের! আমরা আর খুলে বলি না, নিজেদের বোকামী গল্প করে আরো বোকা বানাব নাকি?

১৯৮৬

টুকিটাকি

কোরবানী ঈদ (১)

আলাউদ্দিন সাহেব ধর্মপ্রাণ মানুষ, ঠিক করলেন কোরবানী ঈদে এবারে খাসী কোরবানী দেবেন। লসএঞ্জেলস শহরে সেটা খুব সোজা ব্যাপার নয়। বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে মাইল পঞ্চাশেক দূরে একটি ফার্মে তিনি কোরবানীর ব্যবস্থা করলেন। ফার্মের মালিকের সাথে ঠিক করে রাখা হল, ঈদের দিন ভোরে সে একটা খাসী জোগাড় করে রাখবে, আলাউদ্দিন সাহেব কোরবানী দিয়ে মাংস কেটেকুটে ফেলবেন। তিনি হাতের কাজে পোক্ত, খাসী-গরু বানিয়ে ফেলেন চোখের পলকে।

ঈদের দিন ভোরবেলা আরো কয়েকজনকে নিয়ে আলাউদ্দিন সাহেব ফার্মে পৌঁছলেন। ফার্মের মালিক কথামতো তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। খাসির কথা বলতেই একগাল হেসে একটা বাক্স খুলে কয়েকটা প্লাস্টিকের থলে বের করে আনল। আলাউদ্দিন সাহেবের পরিশ্রম বাঁচানোর জন্যে সে ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে খাসি কেটেকুটে মাংস বানিয়ে রেখেছে। খাসিটাকে মেরেছে মাথায় গুলি করে, বরাবর যে রকম মারে।

পরবর্তী অংশটুকু আর বলে কাজ নেই, ধর্মপ্রাণ মানুষের সাথে পরোপকারী আমেরিকানের হাতাহাতি কোনো সুখপাঠ্য জিনিস নয়।

কোরবানী ঈদ (২)

সিয়াটলে তখন আমরা অল্প কয়জন বাঙালি, আমাদের যে বাংলাদেশ সমিতি ছিল তার কাজকর্মও ছিল খুব সরল। যে কোনো উপলক্ষে আমরা একটা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করে ফেলতাম। কোরবানী ঈদ উপলক্ষে সেটাকে আরো গুরুতর করার জন্যে আমরা সেবার একটা খাসী কোরবানী করে ফেললাম। পরোপকারী আমেরিকানের হাত বাঁচিয়ে সেটাকে রীতিমতো দোয়াদরুদ পড়ে জবাই করা হয়েছিল। গোশত নিয়ে এসে তিনভাগ করে একভাগ গরিব-দুঃখীর জন্যে আলাদা করে ফেলা হল, অন্য দুই অংশ দিয়ে সে রাতে একটা ভয়াবহ রকম খাওয়া-দাওয়া হল।

এ পর্যন্ত কোনো রকম সমস্যা ছাড়াই কেটেছে, কিন্তু মাংস বিতরণ করার জন্যে গরিব-দুঃখী খোঁজা শুরু করার পরই গোলমালের সূত্রপাত। ব্যাপারটি সহজ নয়, সপ্তাহ দুয়েক খোঁজাখুঁজি করেও মাংস দেবার মতো কোনো গরিব-দুঃখীর খোঁজ পাওয়া গেল না।

মাংসটুকু শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজেদেরই খেতে হয়েছিল, আমাদের ভিতরেই কে যেন ফতোয়া দিল, দুঃস্থ গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট হিসেবে গরিবদের বিতরণ করার জন্যে আলাদা করে রাখা মাংস আমাদের খাওয়া জায়েজ আছে।

ড্রাগ

বাথরুমে দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে 'মূত্র ত্যাগ' করছি (পাঠকদের কাছে মাপ চাই, শালীনতা বজায় রেখে ব্যাপারটি লেখার সত্যি কোনো উপায় নেই), মূত্রধারার দিকে তাকিয়ে বন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, দেড় শ' ডলার বেরিয়ে গেল!

আমি অবাক হয়ে বললাম, মানে?

বন্ধু বললেন, সব জায়গায় ড্রাগস নিয়ে খুব হৈচৈ হচ্ছে, তাই অনেক জায়গায় ড্রাগের জন্যে পেশাব পরীক্ষা করে দেখা শুরু হয়েছে। যারা ড্রাগস খায় না তাদের পেশাবের এখন অনেক দাম, কালোবাজারে বিক্রি হচ্ছে বলে শুনেছি।

সত্যি?

সত্যি। হ্যাঁ, এক আউন্স তিরিশ ডলারের মতো, কি মনে হয়, প্রায় চার আউন্সের মতো বের করে দিলাম না?

জিম

কনফারেন্সে একদিন জিম হন্তদন্ত হয়ে এসে বলল, জাফর, একটা উপকার করতে পারবে?

আমি বললাম, কি উপকার?

জোসেফকে এই প্যাকেটটা দিয়ে বলবে, তার জন্যে সব ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে।

ঠিক আছে। আমি প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বললাম. কোনো সমস্যা নেই।

বাঁচালে তুমি আমাকে, তাহলে আমি এক্ষুনি চলে যেতে পারব।

জিম চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে থামালাম, আগে বলে দিয়ে যাও জোসেফটা কে।

জোসেফকে চেন না? ঐ যে সেমিনারের সময় সামনের বেঞ্চে বসেছিল সবুজ রঙের শার্ট পরে।

আমি কারো শার্টের রঙ মনে করে রাখি না।

মাঝামাঝি সময়ে একটা প্রশ্ন করেছিল, কাপলিং স্ট্রেংথ নিয়ে।

আমি মাথা চুলকে বললাম, সেমিনারের মাঝামাঝি আমার সবসময়ই একটু তন্দ্রামতো এসে যায়।

জিম একটু চিন্তিত হয়ে বলল, মুখে দাড়ি-গোঁফ আছে-

পদার্থবিদদের সবসময় দাড়ি না হয় গোঁফ থাকে, সেটা দিয়ে কাউকে চেনা যায় না।

জিম আরো খানিকক্ষণ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে রেগে-মেগে বলল, তোমাকে দিয়ে কখনো কোনো কাজ হয় না, ঠিক আছে, তোমাকে আর কিছু করতে হবে না, আমিই বলে দেব তাকে যা দরকার।

খানিকক্ষণ পর দেখলাম, জিম জোসেফকে খুঁজে বের করছে. সেমিনারে একজন বিকলাঙ্গ মানুষ ছিল, কুঁকড়ে থাকা কুঁজো শরীরের একজন মানুষ, সেই হচ্ছে জোসেফ। সেমিনারে সারাক্ষণই তাকে আমি লক্ষ্য করেছি, নিজের অজান্তেই চোখ চলে যাচ্ছিল। জিম যদি একবার বলত, বিকলাঙ্গ মানুষটি হচ্ছে জোসেফ, তাহলে সাথে সাথে তাকে আমি চিনে যেতাম।

জিম বলেনি, সেই থেকে আমি জিমের নাম আমার ভালোমানুষের খাতায় বড় বড় করে লিখে রেখেছি।

খেলনা

নতুন আমেরিকায় এসে আমি সুপার মার্কেট গিয়েছি। সুপার মার্কেট সত্যিই 'সুপার' মার্কেট, এমন কোনো জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। প্রথম সারিতে শাক-সব্জি, দ্বিতীয় সারিতে কাপড় আর বাসন ধোওয়ার সাবান পার হয়ে তৃতীয় সারিতে এসে আমার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। পুরো সারি বোঝাই নানা রকম খেলনা, দেখে চোখ ফেরানো যায় না। নানা রকম বল, ছোট ছোট জীবজন্তু, প্লাস্টিকের একটা হাম বার্গার দেখে কে বলবে এটা সত্যি নয়? খেলনাগুলি দেখতে দেখতে কেন জানি একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এল। দেশের কয়টা বাচ্চা খেলনা দিয়ে খেলার সুযোগ পায় কেউ কোনো দিন হিসেব করে দেখেছে? বেশিক্ষণ সেখানে থাকতে পারলাম না, তাড়াতাড়ি সরে গেলাম।

এরপর দীর্ঘদিন পার হয়ে গেছে, এখনো আমি খেলনার এই অংশটুকু দ্রুত পার হয়ে যাই, বাচ্চাদের খেলনা দেখতে আমার খারাপ লাগে না, ভালোই লাগে, কিন্তু এগুলি পোষা কুকুর এবং বেড়ালের খেলনা।

পাইলট

লসএঞ্জেলস থেকে সিয়াটল যাচ্ছি। সময়টা গ্রীষ্মকাল। লসএঞ্জেলস একেবারে আগুনের মতো গরম। সিয়াটল বৃষ্টি-বাদলার দেশ, সবসময়েই একটু ঠাণ্ডা থাকে। গরম থেকে উদ্ধার পাবার আনন্দেই কি না জানি না, প্লেন ছাড়তেই প্রায় শ'তিনেক যাত্রীর সবাই আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, আমেরিকানরা আনন্দ গোপন রাখার চেষ্টা করে না। সিয়াটল পৌঁছুতে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগার কথা, আজ বেশ আগেই পৌঁছে গেলাম। পিছন থেকে বাতাস (টেল উইন্ড) পেলে অনেক সময়ই সময়ের আগে পৌঁছে যাওয়া যায়। শহরের কাছাকাছি পৌঁছুতেই পাইলটের গলা শোনা গেল, ভদ্রমহোদয় এবং ভদ্রমহিলারা, আমরা সিয়াটলে প্রায় পৌঁছে গেছি। কিন্তু এসে গেছি অনেক আগে, এত আগে গিয়ে কি

হবে, আরেকটু ঘুরে এলে কেমন হয় ? মাউন্ট রেইনিয়ারটাকে আজ দারুণ দেখা যাচ্ছে, গিয়ে দেখে আসি ? রাজি ?

প্লেনের সবাই চিৎকার করে বলল, রাজি।

আমি অবাক হয়ে দেখলাম, পাইলট সত্যি সত্যি এত বড় প্লেনটাকে ঘুরিয়ে মাউন্ট রেইনিয়ারের দিকে রওনা দিয়েছে। মাউন্ট রেইনিয়ার সিয়াটল শহর থেকে প্রায় দুশ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের চূড়া। পাহাড়ের উপর সাদা বরফের আস্তরণ, চারদিকে গ্লেসিয়ার নেমে আসছে, সব মিলিয়ে অপূর্ব একটি দৃশ্য! দিন পরিষ্কার থাকলে এটিকে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে দেখতে পেতাম, অনেকবার কাছে এসেও দেখেছি, কিন্তু প্লেনে করে চারদিকে ঘুরে কখনো দেখিনি! পাইলট খুব কাছে দিয়ে একবার ঘুরে এল, আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম।

পাইলট প্লেনটাকে আবার সিয়াটলের দিকে ঘুরিয়ে বলল, এবারে ফিরে যাওয়া যাক, দেরি হলে আবার ঝামেলা না হয়ে যায়!

গোপন ব্যাপার

বন্ধু কাছে এসে গলা নামিয়ে বলল, ইকবাল ভাই, খাবেন নাকি একটা– জিনিসটার নাম উচ্চারণ না করে সে অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে বাম চোখটা একটু ছোট করল।

আমি চারদিকে তাকিয়ে ফিস ফিস করে বললাম, চল।

ল্যাবরেটরির সবার চোখ এড়িয়ে আমরা সাবধানে বের হয়ে এলাম। পিছন দিকে গাছপালা ঘেরা একটা জায়গা আছে, বাইরে থেকে সহজে চোখে পড়ে না। সেখানে পৌঁছে বন্ধুটি পকেট থেকে জিনিসটি বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিল, আমি হাতে নিয়ে এদিক-সেদিক দেখে সাবধানে সেটাতে আগুন জ্বালালাম।

না, কোনো মাদকদ্রব্য নয়, আমরা সিগারেট খেতে বের হয়ে এসেছি। ল্যাবরেটরিতে প্রায় শ'খানেক লোক কাজ করে, তার মাঝে আমরা দুজন সিগারেট খাই, দুজনেই বাঙালি।

এটি অনেকদিন আগের কথা, এর পর আমি সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, কাজেই ঠিক বলতে পারব না আজকাল সিগারেট খাওয়া কতটুকু কঠিন ব্যাপার। বাইরে, লোকালয়ে, যানবাহন বা প্লেনে সিগারেট খাওয়া ইতোমধ্যে বেশিরভাগ জায়গাতেই বেআইনী হয়ে গেছে। আমি প্রায় নিশ্চিত, আর কিছুদিনের মধ্যেই মানুষজনকে নিজের ঘরে লুকিয়ে সিগারেট খেতে হবে। লুকিয়ে লুকিয়ে কাজকর্ম করে আনন্দ নেই, তাই আগেই ছেড়েছি সিগারেট খাওয়া।

শামুক

একবার কয়েকটা আমেরিকান পরিবারের সাথে শামুক শিকারে গিয়েছিলাম। শামুক নানা রকমের হয়ে থাকে, আমরা যেটাকে তুলতে গিয়েছি সেটাকে বলে 'ওয়েস্টার'। ওয়েস্টার দেখতে অনেকটা ঝিনুকের মতো, শিকার করাও খুব সহজ। এক জায়গায়

পড়ে থাকে, গিয়ে তুলে নিলেই হয়। আমেরিকানরা ওয়েস্টার খুব শখ করে খায়, যেখানে গিয়েছি সেখানকার নিয়ম হল, ওখানে বসে রান্নাবান্না করে যতখুশি ওয়েস্টার খাওয়া যাবে, কিন্তু সাথে করে আনতে পারবে মাত্র আঠারটা। বাঙালি বলে ওয়েস্টার খাই না, তাই আমাদের দলে নিতে সবার উৎসাহ।

খুঁজে খুঁজে ওয়েস্টারের একটা খনি আবিষ্কার করা হল। হৈচৈ করে ওয়েস্টার তুলে আনলাম আমরা, মোটা মোটা শাসালো ওয়েস্টার দেখে একেকজনের জিবে পানি এসে যাচ্ছে। দেরি সহ্য হয় না। চাকু বের করে ওয়েস্টারে। ফাঁকে চাপ দিতেই ওয়েস্টার খুলে গেল, ভিতরে থল থল করছে ওয়েস্টারের কাঁচা মাংস, দেখেই কেমন জানি গা ঘিন ঘিন করে উঠল আমার। কিছু বোঝার আগেই আমার বন্ধুটি সেটা মুখে লাগিয়ে সুড়ৎ করে ঝোলের মতো টেনে নিয়ে পুরোটা কোঁৎ করে গিলে নিল। রান্না করেও খাওয়া যায়, কিন্তু এভাবেই নাকি খেতে সবচেয়ে মজা।

অনেক কষ্ট করে সকালে খাওয়া রুটি মাখনকে উপর দিয়ে বেরিয়ে আসতে না দিয়ে পেটে আটকে রাখলাম।

বহুদিন পর একজন বাঙালিকে পেয়েছিলাম যার খাওয়া সংক্রান্ত ব্যাপারে লজ্জা-ঘেন্না ইত্যাদির কোনো সমস্যা ছিল না, সেও কাঁচা ওয়েস্টার বেশ শখ করে খেত। তার কাছে শুনেছিলাম যে, কাঁচা ওয়েস্টারে স্বাদ নাকি তাল শাঁষের মতো! দেশে ফিরে গিয়ে এখন কি আর কোনোদিন তাল শাঁস খেতে রুচি হবে ?

সান্টা আনা উইন্ড

লসএঞ্জেলস এলাকায় প্রচলিত প্রবাদ হচ্ছে যে, এখানে যখন সান্টা আনা উইন্ড বইতে থাকে তখন সবচেয়ে যে সতী-সাধ্বী স্ত্রী সেও নাকি তার স্বামীর গলায় বসানোর জন্যে চাকু শানাতে থাকে। এখানে নতুন এসে তাই আমার সান্টা আনা উইন্ড জিনিসটা কি এবং কেন তাকে নিয়ে এরকম একটা কথা প্রচলিত, জানার কৌতূহল ছিল। কাজেই যখন হঠাৎ একদিন সান্টা আনা উইন্ড বইতে শুরু করল, আমি খুব আগ্রহ নিয়ে ব্যাপারটি লক্ষ্য করলাম। এটি ভৌগোলিক কারণে উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসা বাতাস। যদিও উত্তর দিক থেকে আসে এটি ঠাণ্ডা বাতাস নয়, মরুভূমির উপর দিয়ে আসে বলে এবং উষ্ণতার তারতম্যের জন্যে বাতাসটি গরমের দিকে। সান্টা আনা উইন্ড যখন বইতে শুরু করে সেটি একটানা কয়েকদিন থাকে। এই বাতাসটা দমকা হাওয়ার মতো এবং বিচিত্র কারণে এটি অনেকটা নাকি কান্নার মতো শব্দ করতে থাকে। গভীর রাতে শেয়ালের ডাক যেমন মনের ভিতরে একটা অকারণ অস্বস্তির সৃষ্টি করে, এটিও সেরকম, বাতাসটির গুমরে গুমরে কাঁদার মতো শব্দ মনের ভিতরে একটা চাপ ফেলতে পারে। এজন্যেই বলা হয় এটিতে শয়তানের ছোঁয়া আছে এটা শুনে সতী-সাধ্বী স্ত্রীরাও স্বামীর গলায় চাকু চালানোর জন্যে চাকুতে শান দিতে থাকে।

কিন্তু শুধু এটা বলার জন্যে আমি সান্টা আনা উইন্ডের কথা টেনে আনিনি, আরো একটা জিনিস বলার আছে। প্রথমবার যখন সান্টা আনা উইন্ড বইতে শুরু

করেছে তখন বেশ রাত, আমি গাড়ি করে ফিরে আসছি। বাতাসের বেগ দেখতে দেখতে বেড়ে উঠে চোখের সামনে একটা গাছের ডাল ভেঙে ফেলল। আমি কোনোমতে গাড়ি থামিয়ে নেমে এসেছি, প্রচণ্ড বাতাস পারলে আমাকে প্রায় উড়িয়ে নেয়। চোখের সামনে গাছের ডাল, পাতা, ইলেকট্রিক তার ছিঁড়ে যাচ্ছে, আমি তবু মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাইরে দাঁড়িয়ে আকশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। বাঙালির ছেলে, কালবোশেখী আর ঘূর্ণিঝড় দেখে দেখে মানুষ হয়েছি, যত বড় ঝড়ই হোক আমার কাছে এটি ছেলেখেলা, তবু আমি নড়তে পারছিলাম না। প্রচণ্ড বাতাসের তাণ্ডবলীলার মাঝে আমি অবাক হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কারণ সারা আকাশে একটু মেঘ নেই, ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র। বিনা মেঘে বজ্রপাত কখনো হয় না কিন্তু বিনা মেঘে ঝড় হয় সেটাও কি কখনো জানতাম?

নক্ষত্র

সময় পেলে কে না আকাশের দিকে তাকায়? উত্তর আকাশে তাকিয়ে ধ্রুবতারা আর সপ্তর্ষিমণ্ডলকে এতবার দেখেছি যে তারা আমার প্রায় আপনজনের মতো। রাত বাড়ার সাথে সাথে সপ্তর্ষিমণ্ডল একটু একটু করে ঘুরে যায়, এর থেকে নিশ্চিত জিনিস আর কি হতে পারে! বহুকাল পর সেদিন হঠাৎ আকাশে নক্ষত্র দেখে ভাবলাম, আমার সেই সপ্তর্ষিমণ্ডলটিকে একবার দেখি। আকাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে দেখি, দেশে যে ধ্রুবতারা দিগন্তের কাছাকাছি ছিল সেটি এখানে কত উপরে উঠে গেছে, প্রায় মাঝ-আকাশে। চেনা মানুষ হঠাৎ অপরিচিতের মতো ব্যবহার করলে যেরকম মন খারাপ হয়ে যায় ধ্রুবতারাকে দেখে আমার ঠিক সেরকম মন খারাপ হয়ে গেল।

১৯৮৭

জুলফি

সেই ছেলেবেলা থেকে বিদেশ সম্পর্কে আমাদের সবার ব্রেন ওয়াশ করা হয়েছে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে শুনে আসছি যা কিছু ভালো সব রয়ে গেছে বিদেশে। একটা বেগুন পর্যন্ত ভালো হলে আমরা বলি বিলাতী বেগুন। শুধু যে জিনিসপত্র ভালো তাই নয়, বিদেশের মানুষও নাকি ভালো! তারা নাকি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, নীতিবান, কর্মঠ এবং সত্যবাদী। শুধু যে চরিত্র ভালো তাই নয়, তাদের নাকি ফিগারও ভালো। মেয়েরা কি শুনেছে জানি না, আমরা ছেলেরা শুনে এসেছি বিদেশের মেয়েরা সেই চমৎকার ফিগার দশজনকে দেখানোর জন্যে যেটুকু কাপড় না পরলেই নয় সেটুকু পরে সবার সামনে ঘোরাঘুরি করে থাকে।

কাজেই সত্যি সত্যি যখন আমরা বিদেশের মাটিতে পা দেই আমরা একেবারে ভাবে গদগদ হয়ে থাকি। মুগ্ধ হতে আমাদের দেরি হয় না, যাকে দেখি তাকে দেখেই আমরা কাত হয়ে যাই। প্রথম যখন আমেরিকা এসে ইউনির্ভাসিটিতে গিয়ে পাকা চুল সৌম্য চেহারা একজন বৃদ্ধকে দেখলাম, আমি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। জ্ঞানতাপস এই বৃদ্ধ কোন্ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী খুঁজে বের করতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম সে ইউনির্ভাসিটির মালী, নির্মমভাবে আগাছা উপড়ে তোলা হচ্ছে তার প্রধান কাজ।

তারপর বহুদিন কেটে গেছে।

ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছি সাদা চামড়া মানেই হোমরাচামরা নয়, তাদের মাঝেও মালী আছে, ধোপা আছে, ঝাড়ুদার, নাপিত সবই আছে। চোরছ্যাচড় বদমাইশ পকেটমারও আছে। এদেশে এতদিন থেকে আছি যে, আজকাল মানুষজনের চেহারা দেখেই আন্দাজ করতে পারি কে কি ধরনের কাজ করে। যতই অগোছালো অযত্নে থাকুক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় প্রফেসরের চোখে বুদ্ধির দীপ্তি থাকে, আবার যত যত্ন করেই সাজ-পোশাক পরুক গাড়ির সেলসম্যানের চেহারায় কেমন জানি তেলতেলে তোষামোদের ভাবটা রয়ে যায়। শুধু তাই নয়, গাড়ি হাকিয়ে আসার পরও অশিক্ষিত ঝাড়ুদারকে দেখেই বুঝা যায় সে ঝাড়ুদার, আবার ছিনতাই করে যে দিন কাটায় একশজনের ভিতরেও তাকে একেবারে আলাদা করে বের করে ফেলা যায়।

চেহারা দেখে কি কাজ করে বলে দেয়ার ব্যাপারটা কিন্তু শুধু ছেলেদের বেলায় খাটে, মেয়েদের বেলায় সেটা খাটে না, অন্তত আমার জন্য খাটে না। একটা মেয়েকে দেখে কখনোই তার সম্পর্কে আমি ঠিক করে কিছু বলতে পারি না। কেমন করে বলব, প্রথম যে জিনিস বয়স, সেটাতেই সব গুবলেট হয়ে যায়। এদেশের

মেয়েদের বিশেষ একটা চেহারা আছে যেটা কুড়ি থেকে পঞ্চাশের মাঝে স্থির হয়ে থাকে। তা ছাড়া অন্য ব্যাপার আছে, সুন্দরী মেয়ে দেখলে আমরা ধরে নেই সে বুদ্ধিমতী, মায়াবতী, স্নেহময়ী, মিষ্টস্বভাবের মানুষ, কার্যক্ষেত্রে সেটা সত্যি হবে সেরকম কোনো গ্যারান্টি নেই। কিন্তু আমরা যেটা বিশ্বাস করতে চাই সেটা আমরা কোনো রকম যুক্তিতর্ক ছাড়াই বিশ্বাস করে বসে থাকি, কেউ সেখান থেকে আমাদের নড়াতে পারে না।

একবার চুল কাটাতে গিয়েছি। মোটামুটি অপ্সরীর মতো চেহারার একজন চুল কাটতে এল। 'বাঙালী হাসির গল্প' পড়ে নাপতেনীর যে ছবি মনের মাঝে রয়েছে তার সাথে কোনো মিল নেই। ধারালো খাপখোলা তলোয়ারের মতো চেহারা দেখলে হা করে তাকিয়ে থাকতে হয়। এই মেয়ে নাপতেনীর কাজ করে সময় নষ্ট করছে কেন কে জানে! এর তো সিনেমায় নায়িকার পার্ট করার কথা। আমি ধরে নিলাম, নিশ্চয়ই এর পেছনেও অত্যন্ত হৃদয়বিদারক কোনো ইতিহাস আছে। মেয়েটি এসে চুল কাটা শুরু করল। চুল কাটার সময় কথাবার্তা বলার রেওয়াজ। মেয়েটা কথা শুরু করল, আর মুখ খুলতেই বুঝতে পারলাম এই মেয়ে যে নাপতেনী হয়েছে সেটা তার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য, তার বুদ্ধিশুদ্ধি ফার্নিচারের মতো। কথাবার্তা নিম্নরূপ : সে জিজ্ঞেস করল, কি কর তুমি ?

আমি একজন পদার্থবিজ্ঞানী।

সেটা কি জিনিস ?

কোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে চিন্তা করতে হলে আমার মাথা চুলকাতে হয়। যখন চুল কাটা হচ্ছে তখন মাথা চুলকানো যায় না। আমি একটু উশখুশ করে বললাম, যে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে সে হচ্ছে পদার্থবিজ্ঞানী।

পদার্থবিজ্ঞান মানে কি ?

এক ধরনের বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান ? সেটা কি ?

আমি হকচকিয়ে গেলাম। বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকাতে বসে একজন মানুষ বিজ্ঞান কি জানে না ? উত্তর দেবার আগে প্রবলভাবে মাথা চুলকানোর দরকার হল, কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব না। পেট চুলকে বললাম, এই যে ইলেকট্রিসিটি, লাইট, গাড়ি এসব নিয়ে যে গবেষণা হয়।

গাড়ি! মেয়েটার চোখ প্রথমবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তাই বল! তুমি গাড়ির মেকানিক?

আমি খাবি খেয়ে বললাম, না মানে–

আমার একটা এইটি সিক্সের কাটলাস সুপ্রিম আছে, গাড়িটার সব ভালো কিন্তু সকালে স্টার্ট নেবার সময় ঝাঁকুনি দিতে থাকে। নিয়ে আসব একদিন তোমার কাছে। কোন্‌খানে কাজ কর তুমি ?

পাঠকবৃন্দ, আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। মেয়েটার যে বুদ্ধিশুদ্ধি ফার্নিচারের মতো শুধু তাই নয়, কাজকর্মও সেরকম। চুল কাটা শেষ হবার পর আমাকে দেখতে ভয়ের সিনেমার ভিলেনের মতো দেখাতে লাগল।

নাপতেনী নিয়ে যখন কথা শুরু করেছি, তাদের নিয়ে আরেকটা গল্প বলি। এদেশে দুরকম নাপিতের দোকান আছে, একটাতে শুধু পুরুষ মানুষেরা যায়, চুলও কাটে পুরুষ মানুষেরা। সেখানে লোকজন ভুসভাস করে সিগারেট খায় রবং সময় কাটানোর জন্য সেখানে প্লে-বয় ইত্যাদি ম্যাগাজিন ইতস্তত ফেলে রাখা থাকে। অন্য নাপিতের দোকানে পুরুষ এবং মহিলা দুজনের চুল কাটা হয় এবং সেখানে চুলও কাটে পুরুষ এবং মহিলারা। তবে কোনো একটা বিচিত্র কারণে যে সমস্ত পুরুষ মানুষেরা মহিলাদের চুল কাটে তাদেরকে 'মেয়েলী পুরুষ' বলে ধরা হয়, কাজেই সেখানে বেশিরভাই হচ্ছে নাপতেনী এবং কেউ যদি চুলকাটার গল্প করতে চায় তার নাপতেনী নিয়ে গল্প করা ছাড়া উপায় নেই। যাই হোক, আরেকবার একজন নাপতেনী আমার চুল কাটছে। চুল কাটার সময় গল্প করা নিয়ম, কাজেই সাথে গল্প হচ্ছে। মেয়েটা ঢুলু ঢুলু চোখে বলল, কাল সারা রাত পার্টি ছিল, ঘুমানোর সময় পাইনি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আজকেও দেখ টানা আটঘণ্টা পায়ের উপর দাঁড়িয়ে।

ক'টার সময় ছুটি তোমার ?

রাত দশটা।

তার মানে এখনো দুই ঘণ্টা ?

হুঁ। দেখ না কী যন্ত্রণা, কখন যে বাসায় যাব! বলেই মেয়েটা ধারালো কাঁচি দিয়ে আমার কানের খানিকটা মাংস তুলে নিল। রক্তারক্তি অবস্থা।

দেশে কাজের মেয়ের উপরে রাগারাগি করা যায় কিন্তু সাদা চামড়ার একটা মেয়ের উপরে রাগ করি কেমন করে ? জোর করে মুখে একটা হাসি ফুটিয়ে শক্ত হয়ে বসে রইলাম। মেয়েটা কয়েকবার মাপ চেয়ে কানে এন্টিসেপটিক লাগিয়ে আবার চুল কাটা শুরু করল।

খুব ক্লান্ত হয়ে আছি, তাই এরকম হল।

বুঝতে পারছি।

আর হবে না, কথা দিলাম। বলে মেয়েটা আমি কিছু বলার আগে ইলেকট্রিক ক্লীপার দিয়ে আমার বামদিকের জুলফিটা পুরোপুরি চেঁছে ফেলল।

আমি হা হা করে উঠলাম, করেছ কি ? করেছ কি ?

মেয়েটা থতমত খেয়ে বলল, কি হয়েছে ?

জুলফিটা চেঁছে ফেললে ?

সেই ছেলেবেলা থেকে জুলফি রেখে আসছি। পৃথিবীর কোনো নাপিতকে সেটা তুলতে দেইনি। কেটে-ছেটে সাজাতে দিয়েছি। যখন লম্বা রাখা স্টাইল তখন লম্বা রেখেছি, যখন খাটো রাখার স্টাইল তখন খাটো রেখেছি কিন্তু কখনো চেঁছে ফেলিনি। রাগে-দুঃখে আমার চোখে পানি এসে গেল। হুঙ্কার দিয়ে বললাম– আমার পারমিশান না নিয়ে তুমি জুলফি ফেলে দিলে ?

মেয়েটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল, আমি ভাবলাম তুমি জুলফি রাখো না।

আমি প্রায় আর্তনাদ করে বললাম, জ্ঞান হওয়ার পর থেকে জুলফি রেখে আসছি আমি।

আমি সত্যি দুঃখিত, সত্যিই দুঃখিত। মেয়েটা একেবারে কাঁদো কাঁদো হয়ে গেল। মনে হল আরেকটু হলে একেবারে কেঁদে ফেলবে। আমি খানিকক্ষণ জুলফিহীন জায়গাটা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, ঠিক আছে, যা হবার হয়েছে। কিছু তো আর করার নেই। কিন্তু অন্যপাশের জুলফিটা তুমি ফেলো না।

মেয়েটা আঁতকে উঠল, কি বললে?

বললাম যে, অন্যপাশের জুলফিটা ফেলো না।

একদিকে জুলফি থাকবে আরেকদিকে থাকবে না? মেয়েটা তখনো নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না।

হ্যাঁ।

মেয়েটা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, খুবই বিচিত্র দেখাবে।

দেখাক।

কখনো কেউ কিন্তু এরকম করেনি।

না করুক।

খুবই কিন্তু বিসদৃশ দেখাবে।

দেখাক। আমি থমথমে মুখ করে বসে রইলাম।

মেয়েটা খানিকক্ষণ আমার দিকে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থেকে আবার হাতে কাঁচি তুলে নিল।

আমি একপাশে জুলফি আরেক পাশে জুলফিহীন অবস্থায় বাসায় ফিরে এলাম।

এরপরে যে ব্যাপারটি ঘটল সেটার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ভেবেছিলাম সবাইকে এরকম খাপছাড়া জুলফির ব্যাখ্যা দিতে দিতে আমার মুখ ব্যথা হয়ে যাবে। কিন্তু অফিস থেকে ঘুরে এলাম, কেউ একটি কথাও বলল না। মনটা একটু খারাপই হল, আমাকে কেউ কি এইটুকুও গুরুত্ব দেয় না? এরকম বিচিত্র অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু সেটা নিয়ে কারো কোনো কৌতূহল নেই? রাতে স্থানীয় বাঙালি মহলে খাবারের দাওয়াত ছিল, নিজের এরকম চেহারা নিয়ে সেখানে যাব না ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু অফিসে কেউ কিছু বলল না দেখে ঠিক করলাম ঘুরে আসি। বাঙালি মহলে কিছু কুটিল বাঙালির সাথে পরিচয় আছে, যারা তাদের পুরো জীবন মানুষের সমালোচনা করে কাটিয়ে দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে। তারা আমার শার্টের রঙ, প্যান্টের কার্টিং, উচ্চারণে আঞ্চলিকতা নিয়ে দীর্ঘ সমালোচনা করে ফেলল কিন্তু জুলফির অসামঞ্জস্য নিয়ে কিছু বলল না। তখন হঠাৎ বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা কোনো কারণে কেউ লক্ষ্য করছে না।

কারণটা কি?

একটু চিন্তা করেই বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটি খুবই সহজ। সোজা সামনে থেকে দেখলে জুলফি দেখা যায় না (গালপাট্টা ধরনের ভয়াবহ কিছু যদি না হয়)। জুলফি দেখা যায় শুধু এক পাশ থেকে দেখলে। কিন্তু পাশ থেকে যখন দেখে তখন একবারে শুরু একটা জুলফি দেখা যায়, কাজেই জিনিসটাতে যে কোনো অসামঞ্জস্য

আছে কেউ সেটা ধরতে পারে না। তখন আমাকে কেউ বাম পাশ থেকে দেখেছে কিছুই অস্বাভাবিক দেখছে না, আবার যখন আমাকে ডান দিক থেকে দেখছে তখনো কিছু অস্বাভাবিক দেখছে না। জিনিসটা অস্বাভাবিক হবে যখন একপাশের সাথে অন্য পাশের তুলনা করবে তখন কিন্তু সেটা খামাখা করবে কেন? যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেখানে তো অস্বাভাবিক কিছু নেই। একটা ভুরু কিংবা অর্ধেক গোঁফ ফেলে দিলে যে ভয়াবহ ব্যাপার হত এটা তো সেরকম নয়! আমার এক চাচাতো ভাইয়ের অর্ধেকটা ভুরু একবার রাতে তেলাপোকা এসে খেয়ে গেল। ভোরে উঠে কি কেলেংকারী! কালী দিয়ে ভুরু এঁকে তারপর ঘর থেকে বের হতে হল। কিন্তু জুলফির বেলা ভিন্ন ব্যাপার।

আমার এই থিওরিটা পরীক্ষা করার জন্যে পরের দিন অফিসে আমার এক আমেরিকান বন্ধুকে বললাম, আমার মাঝে তুমি কি বিচিত্র কোনো জিনিস লক্ষ্য করেছ?

সে খুঁটিয়ে আমাকে দেখল। ডানদিকে থেকে দেখল, বাম দিক থেকে দেখল, উপর থেকে দেখল, নিচ থেকে দেখল, তারপর বলল, তোমার চেহারার কথা বলছ?

না।

তাহলে বিচিত্র কিছু নেই।

আবার দেখ। ভালো করে দেখ। আমি জুলফিতে হাত দিয়ে বললাম, এগুলি দেখ।

হঠাৎ করে সে আমার খাপছাড়া জুলফি আবিষ্কার করে ফেলল। চিৎকার করে বলল, হায় খোদা! কী হয়েছে তোমার? খালি দেখি একপাশে জুলফি!

হ্যাঁ।

কি হয়েছে? এরকম কেন?

আমি একগাল হেসে তাকে পুরো ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে শোনালাম। শুনে সে যে পেটে হাত দিয়ে খ্যাক খ্যাক করে হাসা শুরু করল আর থামার নাম নেই।

আমার থিওরিটা সত্যি বের হয়েছে কিন্তু আমেরিকান বন্ধুকে দিয়ে সেটা পরীক্ষা করানোটা আমার জন্য ভালো হল না। সেই ফাজিল বন্ধু সবাইকে বলে বেড়াল যে আমি নাকি বিশেষ কালচারাল কারণে শুধু একপাশে জুলফি রাখি। প্রতিদিন সকালে শেভ করার সময় বামপাশের জুলফিটা নিয়মিতভাবে চেঁছে ফেলি! অন্য সবাই সেটা সত্যি কি না দেখার জন্যে এসে আমাকে পরীক্ষা করে যেতে থাকল। সে এক মহা যন্ত্রণা। দুই সপ্তাহ পার হবার পর শান্তি। কচি জুলফি গজাতে সেরকমই সময় লাগে।

পরের বার চুল কাটাতে গিয়েছি, তখন আরেকজন মেয়ে এসেছে। হাতে কাঁচি নিতেই বললাম, আমি কিন্তু জুলফি রাখি। কেটে ফেল না কিন্তু।

মেয়েটি বলল, কাটব না, ভয় নেই। চুল কাটতে কাটতে গল্প শুরু হল। আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মেয়েটি অসাধারণ বুদ্ধিমতী। পৃথিবীর এমন কোনো জিনিস নেই যা সে জানে না। আর কী সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি! এমন চমৎকার একটা মেয়ে এরকম একটা কাজ কেন বেছে নিয়েছে? একটু ইতস্তত করে এক সময় তাকে জিজ্ঞেসই করে ফেললাম।

মেয়েটা হেসে বলল, বেশ ভালো পয়সা পাওয়া যায় এখানে, তাছাড়া কাজে কোনো স্ট্রেস নেই। আমি বাড়তি কাজটাজ করে পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। সামনের বছর ইউনিভার্সিটিতে ঢুকব। আর্কিটেকচার পড়ার ইচ্ছে।

আমি মনে মনে ভাবলাম, সত্যিই তো, যে চুল কাটার কাজ বেছে নিয়েছে সারা জীবন তাকে চুলই কাটতে হবে কে বলেছে? যে জীবনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আছে তার থেকে ভালো আর কি হতে পারে?

মেয়েটা যখন ইলেকট্রিক ক্লীপার নিয়ে জুলফির কাছে এগিয়ে এল, আমি বললাম, মনে আছে তো? জুলফি কিন্তু ফেলে দেবে না।

মনে আছে। মেয়েটা হেসে বলল, তুমি এটা নিয়ে খুব টেনশানে আছ মনে হয়।

হ্যাঁ, গত বার তোমাদের একজন আমার একটা জুলফি ফেলে দিয়েছিল। শুধু একটা নিয়ে থাকতে হয়েছিল আমার।

মেয়েটা থমকে দাঁড়াল। চোখ বড় বড় করে বলল, তুমিই সেই লোক! আমরা শুনেছি তোমার কথা! সবাই শুনেছি।

আমি দাঁত বের করে হাসার চেষ্টা করলাম।

তোমাকে সবাই দেখতে চাইছিল। নিজের ইচ্ছায় একপাশে জুলফি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এ রকম মানুষ খুব বেশি নেই।

থাকার কথা না।

আমি কি অন্যদের তোমার কথা বলে আসতে পারি?

তোমার ইচ্ছে।

মেয়েটা তার সব সহকর্মীদের কি একটা বলে এল, সাথে সাথে কাজ বন্ধ করে সবাই চোখ বড় বড় করে আমার দিকে ঘুরে তাকাল।

আমি সবার দিকে তাকিয়ে আবার দাঁত বের করে হাসলাম।

কি করব এ ছাড়া?

ভূমিকম্প

লসএঞ্জেলস শহরের উপকণ্ঠে প্যাসাডিনা নামক শহরে আমি প্রায় পাঁচ বছর ছিলাম। এই দীর্ঘ সময় আমার বাসায় দরজার কাছে একটা তোয়ালে ঝুলত। কেন, কেউ কি আন্দাজ করতে পারবে?

পারার কথা নয়, কারণ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে হলে বেশ কয়েকটা জিনিস জানা দরকার। তার প্রথমটা হচ্ছে, আমার ভাগ্যলিপির তীক্ষ্ণ রসিকতাবোধ। একটু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। মনে করা যাক, আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে হেঁটে যাচ্ছি, ঠিক তখন আকাশ দিয়ে এক ঝাঁক পাখি উড়ে যাচ্ছে। অবধারিতভাবে সেই চমৎকার পাখিগুলির একটি আমার মাথায় প্রাকৃতিক কাজ সেরে ফেলবে। কিংবা ধরা যাক, কারো বাসায় বেড়াতে গেছি, দেখা যাবে তাদের মোটামুটি ভদ্র কুকুরটি হঠাৎ খেপে উঠে ঘেউ ঘেউ করে আমাকে তাড়া করছে আর আমি প্রাণ হাতে নিয়ে উর্ধশ্বাসে দৌড়াচ্ছি। কিংবা আমি রেস্টুরেন্টে খেতে গেছে। আমার টেবিলের ওয়েটার কোনো কারণ ছাড়াই ধাক্কা দিয়ে পানির গ্লাস আমার কোলে ফেলে দেবে। শুধু তাই না, পানি ছলকে পড়ে আমার প্যান্টের এমন একটা অংশ ভিজে যাবে যে সেটা শুধুমাত্র একভাবেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব এবং আমার বয়সী একজন মানুষের জন্যে সেটা সম্মানজনক ব্যাখ্যা নয়। এক কথায় বলা যায়, যে কোনো পরিস্থিতিতে যে জিনিসটা ঘটলে আমার পক্ষে সবচেয়ে বেশি লজ্জা পাওয়া সম্ভব সেটাই ঘটবে। এখন পর্যন্ত তাই ঘটে আসছে।

বাসার দরজার কাছে তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখার দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে লসএঞ্জেলস শহর। এই শহরটি দুটি সচল ভূখণ্ডের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত। প্রকৃতির খেয়ালে এই শহরে প্রতি সপ্তাহে ছোটখাট একটি, মাসে মাঝারী গোছের এবং বছরে মোটামুটি বড়সড় একটা ভূমিকম্প হয়। শুধু তাই নয়, পঞ্চাশ বছরের ভিতর এই এলাকায় একটা প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প হবার কথা। আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, যারা অবিশ্বাস করেন খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।

এবারে নিশ্চয়ই সবার কাছে তোয়ালে রহস্য পরিষ্কার হয়েছে। দেখা গেছে, যখনই লসএঞ্জেলস শহরে ভূমিকম্প আঘাত করেছে আমি তখনই বাথরুমে! পায়ের নিচের মাটি যখন থর থর করে কাঁপতে থাকে অনেক মানুষ তখন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় থাকতে পারে। আমি পারি না। ভূমিকম্প শুরু হলে আমার মস্তিষ্কের যাবতীয় কার্যকলাপ শর্ট সার্কিট হয়ে যায় এবং আমি যে অবস্থাতে আছি সে অবস্থাতেই বিকট চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বের হয়ে যাই। আমি পুরোপুরি দিগম্বর অবস্থায় বের হতে চাই না, যদিও আমার ভাগ্যলিপি সে চেষ্টাই করছে।

পুরোপুরি দিগম্বর অবস্থায় বের হওয়ার দৃশ্যটি সুন্দর নয়। কোনো এক ভূমিকম্পের সময় পাশের বাসার একজন দুই হাতে দুই শিশু সন্তান ঝুলিয়ে দিগম্বর অবস্থায় বের হয়েছিল, যারা দেখেছে দৃশ্যটি তাদের মনে গাঁথা হয়ে গেছে। আমি চাই না আমার সেরকম একটি দৃশ্য কারো মনে গাঁথা হয়ে থাকুক।

সে কারণে দরজার পাশে একটা তোয়ালে ঝুলিয়ে রাখি, ভাগ্যলিপিকে ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে সেটা আঁকড়ে ধরে বের হয়ে যাব, সেই আশায়।

লসএঞ্জেলস এলাকায় আজ থেকে পঞ্চাশ বছরের মাঝে যে কোনো সময়ে একটা ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হবে, রিক্টর স্কেলে আট কিংবা তারও বেশি। রিক্টর স্কেল তৈরি হয়েছে প্রফেসর রিক্টরের নামানুসারে। তিনি ক্যালটেকের প্রফেসর ছিলেন। ক্যালটেক প্যাসাডিনা শহরে, আমি যেখানে কাজ করি। ভূমিকম্প সংক্রান্ত বড় বড় গবেষণা যে ক্যালটেকে হবে, বিচিত্র কি ? হাতে-কলমে দেখার জন্যে খাঁটি ভূমিকম্প এত নিয়মিতভাবে আর কোথায় পাওয়া যাবে ?

রিক্টর স্কেলে আট খুবই বড় ভূমিকম্প, যদিও আট সংখ্যাটি মোটেও বড় নয়। আমি সবচেয়ে বড় যে ভূমিকম্প দেখেছি সেটা ছিল রিক্টর স্কেলে ছয়। সেই ভূমিকম্প যখন প্যাসাডিনা শহরে আঘাত করে আমি তখন নিয়মমাফিক বাথরুমে, শালীনতার কারণে আর কিছু বলছি না। হঠাৎ করে মনে হল, পুরো মেঝে পায়ের নিচ থেকে জীবন্ত প্রাণীর মতো সরে গেল। ভূমিকম্প হলে মানুষ প্রথমে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা কি, আমার বেলায় সেরকম কিছু হল না, বুঝে গেলাম ব্যাপারটা কি। সাথে সাথে আমার মস্তিষ্ক শর্ট সার্কিট হয়ে গেল। চিৎকার করতে করতে বাথরুম থেকে বের হতে গিয়ে ঘরের এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে আছড়ে পড়লাম, সেখান থেকে অন্য দেয়ালে। মনে হল আমি একটা ইঁদুর, দুষ্টু একটা ছেলে আমাকে একটা কৌটার মাঝে ভরে ঝাঁকাচ্ছে। ঘরের সব জিনিসপত্র শব্দ করে পড়ছে, তার মাঝে কোনো মতে সবাইকে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলাম। বাইরে দাঁড়াতেই ভূমিকম্পের দ্বিতীয় আঘাতটি এল, দেখলাম, দূর থেকে মাটির উপর দিয়ে একটা ঢেউ আসছে যেন শক্ত মাটি নয়, তরল পানি। সেই ঢেউ আমাদের নিচ দিয়ে চলে গেল। বিচিত্র সেই অনুভূতি! যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছি সেই মাটি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে জগৎ-সংসার বড় অনিশ্চিত হয়ে যায়।

ভূমিকম্পের ধাক্কাটা চলে যাবার পর শুনলাম, শহরের অসংখ্য গাড়ি কাতর স্বরে চিৎকার শুরু করেছে। এটি নতুন জিনিস। এ শহরে যত মানুষ তার চেয়ে বেশি গাড়ি এবং তার প্রায় সমান সংখ্যক গাড়ি-চোর। গাড়িকে চোরদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আজকাল নানারকম যন্ত্রপাতি পাওয়া যায়। সেগুলি গাড়িতে লাগিয়ে নিলে কেউ গাড়িকে স্পর্শ করামাত্রই গাড়ি তারস্বরে চিৎকার শুরু করে দেয়। ভূমিকম্পের ধাক্কা খেয়ে তাই হয়েছে। গাড়ি বিভ্রান্ত হয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

বড় ভূমিকম্প হবার পর অসংখ্য ছোট ছোট ভূমিকম্প হয় যার নাম আফটার শক। আফটার শকগুলিও তাচ্ছিল্য করার মতো না। সেগুলি একটু কমে যাবার পর বাসার ভিতরে ঢুকলাম, প্রথম কাজ টেলিভিশন চালু করা।

উদভ্রান্ত চেহারার একজন নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে টেলিভিশনে এই ভূমিকম্পটা নিয়ে কথাবার্তা বলছে। ভূমিকম্প চলাকালীন কি করা উচিত এবং কি করা উচিত নয় সেটাই মূল বক্তব্য। অনেকটা এরকম : "ভূমিকম্প আঘাত করলে সবচেয়ে প্রথমে যে জিনিসটা করতে হয় সেটা হচ্ছে ভয় না পাওয়া। আপনারা ভয় পাবেন না, মাথা ঠাণ্ডা রাখবেন... "

বলতে বলতে হঠাৎ আরেকটা আফটার শক এল. বেশ বড়সড় এটা, আমাদের বাসা এবং টেলিভিশন স্টুডিও একইসাথে দুলতে শুরু করছে। টেলিভিশনের লোকটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। টেবিল ধরে একবার আমাদের দিকে তাকাল, তারপর একবার উপরে, তারপর হঠাৎ বাবা গো মা গো বলে এক লাফ দিয়ে টেবিলের নিচে। আমি নিজেও লাফ দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু টেলিভিশনের দৃশ্যটি দেখে হাসির চোটে আর লাফ দিতে পারলাম না।

প্যাসাডিনা শহরের সেই ভূমিকম্পটি বড় ভূমিকম্প ছিল কিন্তু সর্বনাশা ভূমিকম্প ছিল না। কারণ, মনে আছে বেলা দশটার দিকে আমি বেশ হেঁটে ক্যালটেকে কাজে গিয়েছিলাম। মাটি কাঁপছিল একটু পর পর কিন্তু বেশ অভ্যেস হয়ে গিয়েছে ততক্ষণে। মানুষের অভ্যাস হবার সীমা দেখলে অবাক হতে হয়। কাজে যাবার সময় দেখলাম, পথের দুধারে বাসাগুলির চিমনি ভেঙে নিচে পড়ে আছে। এখানকার বেশিরভাগ বাসা কাঠ দিয়ে তৈরি ; শুধু চিমনীটা ইটের। যখন ভূমিকম্প হয়, কাঠের বাসা ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে নড়ে ধাক্কাটা সহ্য করে। তখন বাসাগুলি এমন অবিশ্বাস্য রকমের শব্দ করতে থাকে যে, স্নায়ু বিকল হয়ে যাবার অবস্থা হয়। চিমনী তা করতে পারে না, শক্ত অনড় বলে কাঁচের মতো ব্যবহার করে, এক ধাক্কায় ভেঙে দু টুকরা হয়ে নিচে পড়ে যায়।

ক্যালটেক গিয়ে প্রথম দেখা হল হার্ব হেনরিকসনের সঙ্গে। সে আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, একগাল হেসে জিজ্ঞেস করল, কি খবর ?

খবর ? কি রকম ভূমিকম্প হল দেখেছ ?

ভূমিকম্প ? ও হ্যাঁ। তাই তো!

তাই তো মানে ? তুমি টের পাওনি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি। ফ্রী ওয়েতে আসছিলাম, হঠাৎ মনে হল টায়ার ফেটে গাড়িটা ঘুরে গেল। মনটাই খারাপ হয়ে গেল। নতুন গাড়ি বুঝতেই পার। হঠাৎ বুঝলাম, ভূমিকম্প- একেবারে ধড়ে প্রাণ দিয়ে এল! যাক বাবা, আমার গাড়ির কিছু হয়নি!

এই হল খাটি লসএঞ্জেলসের মানুষ! ভূমিকম্পকে ওরা থোড়াই কেয়ার করে- গাড়ির কিছু না হলেই খুশি!

হার্ব হেনরিকসনকে নিয়ে আমি নিচে গেলাম। সেখানে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটি দাঁড়া হচ্ছে। পুরো দায়িত্ব আমার, অন্যান্য জিনিসের মাঝে রয়েছে দুইশ পঞ্চাশ হাজার ডলারের কিছু দুষ্প্রাপ্য গ্যাস! ভূমিকম্পে ধ্বসে পড়ে যদি কোনভাবে ঐ আড়াই শ'হাজার ডলারের গ্যাস বের হয়ে যায় তাহলে আমি গেছি- ব্রাজিলে পালিয়ে যেতে হবে। (এখানে মানুষ খুন করে লোকজন পালিয়ে ব্রাজিলে চলে যায়!) নিচে গিয়ে দেখলাম, এক্সপেরিমেন্ট তার দুষ্প্রাপ্য গ্যাস নিয়ে স্থির

দাঁড়িয়ে আছে। মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম যে, থাকবে, যখন এটা ডিজাইন করেছি সেভাবেই করেছি। ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও যেন এটাকে টলাতে না পারে। এখানে সেটা ভুলে গেলে চলে না, কেউ ভুলে না।

১৯৮৭ সালের ১লা অক্টোবরের সেই ভূমিকম্প ছিল রিক্টর স্কেলে ছয়। রিক্টর স্কেলের আট যে ভূমিকম্পটি এখানে যে কোনো মুহূর্তে হতে পারে সেটি হবে এর থেকে এক হাজার গুণ শক্তিশালী। হ্যাঁ, বাড়িয়ে বলছি না, এক হাজার গুণ বড়! ব্যাপারটা জানার পর আমার মানসিক শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল, রাতে ঘুমাতে পারি না, ছোটখাট শব্দ শুনে লাফিয়ে উঠে বসে পড়ি, খাবারে রুচি নেই, জীবনে আনন্দ নেই। তাই একদিন লাইব্রেরি থেকে ভূমিকম্পের উপর লেখা সব বই কিনে আনলাম, সেগুলি পড়ে মনে খানিকটা সাহস ফিরে এল। কারণ মাটি কাঁপার একটা সীমা আছে, এর বেশি কাঁপতে পারে না- রিক্টর স্কেলে ছয় ভূমিকম্পটি মোটামুটিভাবে সবচেয়ে বেশি কাঁপার সীমা। রিক্টর স্কেলে আট ভূমিকম্পটি যেহেতু একহাজার গুণ বেশি শক্তিশালী, সেটা বিপুল এলাকা জুড়ে হবে- দীর্ঘ সময় ধরে হবে। কিন্তু যে ভূমিকম্পটি দেখেছি সেটার মতোই হবে- তার থেকে বাড়াবাড়ি কিছু জোরে হবে না! সেটা জানার পর আবার শান্তিতে ঘুমানো শুরু করলাম। ভালো ঘুমের জন্যে জ্ঞানের উপরে কোনো জিনিস নেই!

ভূমিকম্প একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সেটা নিয়ে রসিকতা করা ঠিক নয়। সৌভাগ্যক্রমে আমি যেগুলি দেখেছি সেগুলি ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প নয়, কাজেই হাস্যকর দিকটা খানিকটা রয়ে গেছে! তার একটা দিয়ে শেষ করি।

আমার সাথে ক্যালটেকে দুজন ছাত্র-ছাত্রী তাদের পিএইচ. ডি-র জন্যে কাজ করে। ছাত্রটি হংকংয়ের, নাম হেনরী। ছাত্রীটি আইরিশ, নাম ব্রিজিত। ছাত্রটি আর দশজন প্রতিভাবান ছাত্রের মতো, ছাত্রীটির কিছু বিশেষত্ব আছে। মনে করা যাক, একসাথে বসে কাজ করছি, হঠাৎ করে আড়মোড়া ভেঙে ব্রিজিত বলল, শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে, একটু দৌড়ে আসি।

আমি বললাম, যাও।

ব্রিজিত তখন দৌড়াতে বের হয়ে গেল। কুড়ি মাইল দৌড়ে ফিরে এল ঘণ্টা দুয়েক পর, তারপর আবার কাজ শুরু করে! ল্যাবরেটরিতে শক্ত কোনো কাজ এলেই তকে দেয়া হত। শক্ত মোটা স্ক্রু এঁটে গেছে কোথাও, বড় রেঞ্চ দিয়ে টেনেও খোলা যাচ্ছে না, তখন খোঁজ পড়ত ব্রিজিতের, সে এসে একটানে খুলে ফেলত। কংক্রীটের দেয়ালে একটা গজাল পুততে হবে, আমরা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি, ব্রিজিত এসে হাতুড়ির এক আঘাতে পুরোটা দাবিয়ে দিল। আমাদের এক্সপেরিমেন্টের এক জায়গায় শ'দুয়েক মোটা মোটা স্ক্রু দু'ইঞ্চি পুরু তামার একটা পাতকে আটকে রাখত। একদিন সেটার উপর কাজ করছি- দু'-একটা বাকি ছিল, ব্রিজিতকে দিয়েছি শেষ করতে। ফিরে এসে দেখি সে বাকি স্ক্রু দুইটা এত শক্ত করে লাগিয়েছে যে দুই ইঞ্চি পুরু তামার পাত পর্যন্ত বাঁকা হয়ে, স্ক্রুর প্যাচ কেটে একটা বিচ্ছিরী অবস্থা! আমাদের দু'সপ্তাহ সময় পার হয়ে গেল সেই সর্বনাশ থেকে উদ্ধার পেতে।

তাকে নিয়ে একদিন কাজ করছি। এক্সপেরিমেন্টের উপর একটা অতিকায় নিউট্রন ডিটেক্টর ঝোলানো হচ্ছে, প্রায় এক টন ওজনের জিনিস, অনেক সাবধানে ঝোলানো হয়। চারপাশে এলুমিনিয়াম রডের থামের মতো আছে, আস্তে আস্তে নামিয়ে তার উপর স্থির করা হয়। ব্রিজিত আর আমি মিলে ডিটেক্টরটি ক্রেন দিয়ে আস্তে আস্তে নামলাম। থামের উপর বসানোর পর সবকিছু ঠিক আছে কি না পরীক্ষার জন্য ব্রিজিতকে বললাম, ব্রিজিত, আস্তে একটু ধাক্কা দাও দেখি।

ব্রিজিত ধাক্কা দিল। সেই ধাক্কায় এক টন ওজনের ডিটেক্টর দুলে উঠল পেণ্ডুলামের মতো, তার ধাক্কায় আমি ছিটকে পড়লাম নিচে। অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমি তাকিয়েছি ব্রিজিতের দিকে- ব্রিজিত চোখ-মুখ কাচুমাচু করে বলল, আমি করিনি, বিশ্বাস কর, আমি না-

তাহলে কে?

ভূমিকম্প।

আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখি সত্যিই তাই, সারা ঘরই কাঁপছে। এক লাফে আমি ঘরের বাইরে!

ব্রিজিতের সাথে অনেকদিন যোগাযোগ নেই। খবর পেয়েছি, বিয়ে করেছে। ক্যাথলিক বলে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকবার যখন খোঁজ নিই, শুনি, আরেকটি বাচ্চা হয়েছে।

অক্টোবর মাস

অক্টোবর মাস অন্য মাস থেকে ভিন্ন কেন ? আমি ঠিক কি উত্তরটা জানতে চাইছি পাঠকবৃন্দের পক্ষে সেটা ধরতে পারা সহজ নয়। কাজেই খামাখা একটা বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন না, উত্তরটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি খানিকক্ষণের মাঝে।

অক্টোবর মাস যে অন্য মাসগুলি থেকে ভিন্ন সেটি আমি প্রথম টের পেয়েছিলাম সিয়াটলে, আমি তখন ইউনির্ভাসিটি অফ ওয়াশিংটনে পিএইচ. ডি. করার চেষ্টা করছি। আমাদের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে একজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁর নাম ছিল হান্স ডেহমলেট। পূর্ব জার্মানি থেকে এসেছিলেন বহুকাল আগে, এবং এই দীর্ঘ দিন থেকেও তাঁর ইংরেজি উচ্চারণের খুব একটা গতি হয়নি। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্যদের মতো তিনিও 't' কে 'S' হিসেবে উচ্চারণ করতেন এবং আমরা ছাত্রেরা সেটাকে মোটামুটি একটা আমোদের ব্যাপার হিসেবে ধরে নিতাম। তাঁর উচ্চারণের জন্যেই হোক কিংবা লম্বা লম্বা জুলফির জন্যেই হোক, ভদ্রলোককে আমি কখনো খুব গুরুত্ব দিয়ে নিইনি। আমাকে একবার জিজ্ঞেস করলেন তাঁর সাথে কাজ করতে রাজি আছি কি না, আমি ভদ্রভাবে এড়িয়ে গেলাম।

এই মোটামুটি আমুদে মানুষটি এক অক্টোবর মাসে একেবারে বিগড়ে গেলেন। মেজাজ প্রচণ্ড খারাপ, ছাত্রদের যাচ্ছেতাই করে গালি-গালাজ করেন। মানুষের মেজাজ থাকলেই সেটা খারাপ হয়, কাজেই সেটা নিয়ে আমি বেশি মাথা ঘামালাম না। কিন্তু পরের বছর আবার সেই একই ব্যাপার, সারা বছর ভালো থেকে অক্টোবর মাসে আবার প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ। ভদ্রলোকের ধারেকাছে কেউ ঘেষতে পারে না।

বুদ্ধিমান পাঠক, কেউ কী কারণটি ধরতে পেরেছেন ? না পারলে বিচলিত হবার কোনো কারণ নেই, আমি নিজেও অক্টোবর মাসের সাথে মেজাজ খারাপ হওয়ার যোগসূত্রটি ধরতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমার এক বন্ধু সেটি আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল। প্রতিবছর অক্টোবর মাসে নোবেল প্রাইজ ঘোষণা করা হয় এবং প্রফেসর ডেহমলেট দীর্ঘদিন থেকে এই প্রাইজটি না পেয়ে অত্যন্ত মেজাজ খারাপ করে ফেলেন। আমার কাছে তখন ব্যাপারটি মোটামুটি একটি রসিকতা হিসেবেই মনে হয়েছিল। এর পর আমি আরো কয়েক জায়গায় এই একই জিনিস দেখেছি। আমার নিজের পরিচিত প্রফেসররা এবং আমরা বন্ধু-বান্ধবদের প্রফেসরদের অনেকে অক্টোবর মাসে নানা রকম মনোকষ্টে ভুগেন। কারো কারো সত্যি ভোগার কারণ আছে, কেউ কেউ নেহায়েত ছেলেমানুষ।

এই জন্যেই বলছিলাম অক্টোবর মাস অন্যান্য মাস থেকে ভিন্ন।

অক্টোবর মাস অন্যান্য মাস থেকে ভিন্ন জানার পর থেকে আমি মোটামোটি বেশ কৌতূহল নিয়ে এই মাসটির জন্যে অপেক্ষা করি। পৃথিবীর কোন্ মনীষীরা এবছর এই দুর্লভ সম্মানে সম্মানিত হবেন জানতে আমার বেশ লাগে। দেশে থাকতে বাইরের

পৃথিবীর সাথে যোগাযোগ ছিল কম, এখানে এসে দেখেছি পৃথিবীটা বেশ ছোট। এত ছোট যে, নোবেল প্রাইজ দেবার পর অনেককেই চিনে ফেলি, চোখে দেখেছি এরকম মানুষ বের হয়ে যায়। সত্যিকারে বিদগ্ধ গুণী মানুষকে সম্মান করার সাথে যে এটি পশ্চিমা জগতের একটা প্রচণ্ড 'হিপোক্রসী' প্রকাশ করে সেটিও দেখার মতো। হেনরী কিসিঞ্জার বা মেনাহেম বেগিন শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পাননি, সেটি এখনো আমার পক্ষে বিশ্বাস করা কষ্টকর।

পাঠকবৃন্দের সম্ভবত ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। কেউ কেউ বলছেন, কোন্ মাসে তুমি কি কর সেটা আমাদের জানার কি প্রয়োজন আছে ? তুমি কোথাকার কোন লাটসাহেব ?

সত্যি কথা।

আমি এবার আসল কথায় চলে আসি।

আমি যেখানে কাজ করি সেখানে আমার সাথে জগৎ-সংসারে উৎসাহী একজন আমেরিকান কাজ করে। সে ইলেকট্রিকেল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পিএইচ. ডি. করেছে। সে প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে এবং ইরাক কুয়েতকে দখল করার আগেই জানত যে পৃথিবীতে ইরাক এবং কুয়েত বলে দেশ রয়েছে। সে তার ছেলেমেয়েকে কনসার্টে নিয়ে যায় এবং মাঝে মাঝে আমার সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবক্ষয় জাতীয় জিনিস নিয়ে আলোচনা করে। এক সোমবার আমাকে দেখে সে ছুটে এল, বলল, জাফড় (এরা 'র' উচ্চারণ করতে পারে না), গত কাল টেলিভিশনে বাংলাদেশের উপরে একটি অনুষ্ঠান দেখিয়েছে।

আমি মনে মনে বললাম, ধরণী দ্বিধা হও। মুখে বললাম, তাই নাকি ? বেশ বেশ। তারপর কেটে পড়ার চেষ্টা করলাম। বাংলাদেশ সম্পর্কে এখানে টেলিভিশনে কি অনুষ্ঠান দেখিয়েছে আজকাল আমার আর জানার ইচ্ছে করে না। গত সপ্তাহেই বিজ্ঞান গবেষণার উপরে আলোচনা করতে গিয়ে একজন উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "কেহ কি বলিতে পারিবে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র দেশে বিজ্ঞানচর্চার কি প্রয়োজন রহিয়াছে।"

আমার সহকর্মী আমাকে ছেড়ে দিল না, বলল, উনুস নামে তোমার দেশে একজন লোক রয়েছে, সাংঘাতিক লোক, ফাটাফাটি লাগিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে!

আমার ধড়ে-প্রাণ ফিরে এল, তাই বল! প্রফেসর ইউনুসের কথা বলছো ? মুহম্মদ ইউনুস, আমার শিক্ষক নন, তাই তাঁকে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনি না, কিন্তু তাঁর ভাই মুহম্মদ ইব্রাহীম আমার ছাত্রজীবনের শিক্ষক, সেই গর্বেই আজকাল আমি মাটিতে পা ফেলি না। আমি একগাল হেসে বললাম, ও প্রফেসর ইউনুসের কথা বলছ ? কি বলেছে টেলিভিশনে ?

সি. বি. এস.-এর সিক্সটি মিনিটে দেখিয়েছে তাঁকে। কি সাংঘাতিক মানুষ! সারা পৃথিবীটা পাল্টে দিচ্ছে দেখি।

আমি মুখে একটা আলগা গাম্ভীর্য নিয়ে তাকে প্রশ্রয় দেওয়ার ভঙ্গিতে হাসলাম, ভাবখানা, এ আর নতুন কি ? আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা এভাবেই পৃথিবীকে পাল্টে দিই।

তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না, দেখে কি যে ভালো লেগেছে আমার। পৃথিবীতে তাহলে এখনো সত্যিকার বিপ্লব হচ্ছে ? কী সাংঘাতিক ব্যাপার!

আমি আবার স্মিত হাসি হাসলাম, ভাবখানা, প্রয়োজন হলে বল, আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা সারা পৃথিবীতে বিপ্লব লাগিয়ে দেব।

তুমি কি আরো কিছু জান এ সম্পর্কে ?

জানি। আমি বললাম, মুহম্মদ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যখনই কোনো লেখা বের হয় আমি সেগুলি কেটে রাখি।

দেবে আমাকে ? দেবে ?

আমি উদারভাবে হাসলাম, কেন দেব না ? অবশ্যি, দেব।

আমার বুক একশ' হাত ফুলে গেল। দীর্ঘদিন থেকে বিদেশে পড়ে আছি, একবারও দেখিনি যে এখাকার রেডিও-টেলিভিশন বা খবরের কাগজে বাংলাদেশকে নিয়ে সম্মানজনক কিছু বলা হয়েছে। এই প্রথমবার আমার দেশের একজন মানুষ দেশকে নিয়ে গর্ব করার সুযোগ করে দিয়েছে। আমাদের মতো কিছু সুযোগসন্ধানী মানুষ, যারা অর্থ-বিত্ত এবং সুযোগের লোভে দেশ ত্যাগ করে বিদেশে পড়ে আছে, তাদেরকে দেশ নিয়ে গর্ব করার সুযোগ করে দেওয়ার দায়িত্ব প্রফেসর ইউনুসের নয়। প্রফেসর ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংক আরো অনেক বড় জিনিস, সারা পৃথিবীর জন্যে এটি আশা নিয়ে এসেছে। কিন্তু কি করব ? সুযোগসন্ধানী হলেও আমরা তো মানুষ, গর্ব করার লোভ যে সামলাতে পারি না!

গ্রামীণ ব্যাংক যে আমাদের দেশের কত বড় একটা উপকার করেছে সেটা বলে বুঝানো যাবে না। বলা যেতে পারে, একটা জাতিকে তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রফেসর ইউনুস মানুষের একটি আশ্চর্য মানবিক জিনিস পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন, সারা পৃথিবীকে দেখিয়েছেন একজন মানুষকে সততার সুযোগ দেয়া হলে সে সৎ থাকতে চায়। যার কিছু নেই তাকে তিনি বিশ্বাস করেছেন, বিশ্বাস করে সাহায্য করেছেন এবং সে বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। একজন নয় দু'জন নয়, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে তিনি তাঁর পরীক্ষাটি করেছেন, এবং মানুষ তার বিশ্বাসের মর্যাদা রেখেছে। সম্ভবত বাংলাদেশ সারা পৃথিবীর মাঝে একমাত্র দেশ, যেখানে আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারব সেখানকার মানুষ কতটুকু সৎ। এখন পর্যন্ত যতজন মানুষকে পরীক্ষা করা হয়েছে তার মাঝে শতকরা আটানব্বইজন! সারা পৃথিবীতে আছে কি কোনো দেশ বা কোনো জাতি যে এরকম জোর গলায় বলতে পারবে ? নেই।

গত কয়েক বছর থেকে তাই অক্টোবর মাসে খুব আশা করে থাকি, মনে হয় এ বছর অর্থনীতির নোবেল প্রাইজটা হয়ত প্রফেসর ইউনুসকে দেয়া হবে! এখনো দেয়নি। আমার দেশের একজন মানুষ নোবেল পুরস্কার পাবে কি না সেজন্যেই আমি এত অস্থির হয়ে পড়ি, কাজেই আমাদের ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর ডেহমলেট যে এত মেজাজ খারাপ করবেন, বিচিত্র কি!

গত বছর অক্টোবর মাসে যখন খুব কৌতূহল নিয়ে খবর শুনছিলাম, তখন হঠাৎ দেখি ডেহমলেট পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়ে গেছেন। আর তাঁর অক্টোবর মাসে তিরিক্ষি মেজাজে থাকতে হবে না।

না জানি আমাদের কতদিন তিরিক্ষি মেজাজে থাকতে হবে।

সৎ ও অসৎ

বিদেশে বসে দেশ কিংবা দেশের মানুষ সম্পর্কে আমরা সবচেয়ে হৃদয়হীন যে কথাটি বলেছি সেটা কি ?

আমার ধারণা, কথাটি হচ্ছে "দেশের সব মানুষ চোর"।

কথাটি অবশ্যি অনেকভাবে বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন গুণী মানুষের মতো : 'মূল্যবোধের যে অবক্ষয় ঘটেছে সেটা থেকে নিস্তার নেই।" কেউ বলেন খুব সমবেদনার সাথে, চোখে পানি এসে যায় দেখলে, মানুষগুলি জানি কেমন হয়ে গেছে। কেউ কেউ খোদাকে টেনে আনে, "এই দেশে খোদার গজব হবে না তো কোথায় হবে ?" কেউ কেউ বলেন নির্বোধের মতো, বলেন, "দেশের সব মানুষ চোর"।

গত সপ্তাহে কথাটি একটু অন্যভাবে শুনেছি, একজন বলেছেন, দেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চোর। সবাই নয়, একশজনের মাঝে নিরানব্বই জন।

কথাটি একটু ভেবে দেখা যাক। কেউ যদি বলেন, শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চোর, তখন হঠাৎ করে মনে হয় এটা একটা সুচিন্তিত মন্তব্য, কারণ কথাটির মাঝে একটা পরিসংখ্যান আছে, গবেষণার লক্ষণ আছে। উক্তিটির পিছনে গভীর ব্যক্তিগত বিশ্বাসের চিহ্ন আছে।

কিন্তু উক্তিটি সত্যি নয়- কারণ সেটা সত্যি হতে পারে না। পৃথিবীর সব দেশের মানুষ একই রকম। কোনো নির্দিষ্ট জাতির চরিত্র অন্য জাতির চরিত্র থেকে উন্নত নয়। যাদের এধরনের বিশ্বাস আছে (হিটলার, সাথে আফ্রিকার লোকজন) তারা সেই বিশ্বাসকে নিয়ে খুব বেশিদূর এগুতে পারেননি। অর্থনৈতিক কারণে কোনো এক অঞ্চলের মানুষ অন্য অঞ্চলের মানুষ থেকে ভিন্নভাবে ব্যবহার করতে পারে সেগুলি সাময়িক ব্যাপার। সেটা থেকে কেউ সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। নিতে চাইলেও নেয়ার পদ্ধতিটা কেমন হবে জানা নেই। পৃথিবীর কোন্ দেশের মানুষ সৎ এবং কোন্ দেশের মানুষ অসৎ এরকম কোন গবেষণার কথা আমার জানা নেই। পরিসংখ্যান থেকে নিতে চাইলে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে ভাবিত হবার কারণ আছে। এস. এন. এল. এ.-এর কেলেংকারীতে যত টাকা চুরি হয়েছে তার পরিমাণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের খরচ থেকে বেশি। বাড়াবাড়ি রকম সভ্য জাতি হিসেবে ইউরোপের কথা বলতে গিয়ে অনেকের মুখে ফেনা উঠে যেতে দেখেছি। ইউরোপের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে রক্তক্ষয়ী হানাহানি দেখে তারা এখন কি বলবেন আমার খুব

জানার ইচ্ছা। অর্থনীতিতে টান পড়া মাত্র বিভিন্ন তথাকথিত সহনশীল জাতি বিদেশী এবং বহিরাগতদের দায়ী করে তাদের উপর চড়াও হয়েছে।

উদাহরণগুলি একটি কথাই বলে, পৃথিবীর সব মানুষ কেউ অন্য মানুষ থেকে ভিন্ন নয়। সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে কোনো মানুষ তার স্বাভাবিক আচরণ থেকে সাময়িকভাবে বিচ্যুত হতে পারে কিন্তু সেটা থেকে একটা দেশ বা জাতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না।

কোনো জাতি সৎ কি অসৎ সেটা নিয়ে পরীক্ষা করার কথা আমি শুনিনি। কিন্তু পৃথিবীতে অন্ততঃ এক জায়গায় মোটামটিভাবে তার কাছাকাছি একটা পরীক্ষা করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ সহায়-সম্বলহীন মানুষকে টাকা ধার দেয়া হয়েছে, তার জন্যে কোনো কিছু বন্ধক রাখা হয়নি। সেই লক্ষ লক্ষ মানুষ সে টাকা সময়মতো ফেরৎ দিয়েছে। একজন-দুজন মানুষ নয়, শতকরা আটানব্বই জন মানুষ। বলা যেতে পারে, শতকরা আটানব্বই জন মানুষ দেখিয়েছে তারা সৎ মানুষ। সারা পৃথিবীতে সেই সংবাদ পৌঁছে গেছে, কারণ অর্থনীতির প্রচলিত নিয়মনীতিতে তার ব্যাখ্যা নেই।

এই দুঃসাহসিক পরীক্ষাটি করেছেন প্রফেসর মুহম্মদ ইউনুস বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে। পৃথিবীতে অন্তত একটি জাতি মাথা উঁচু করে বলতে পারে, একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে সে জাতির শতকরা আটানব্বই জন মানুষ সৎ।

তাহলে কেন আমাকে শুনতে হয় বাংলাদেশের শতকরা নিরানব্বই জন মানুষ চোর?

কেউ কি আমাকে বুঝিয়ে দেবে?

১৯৯২

খাবার

আমি সচরাচর ফলমূল খাই না। ছেলেবেলায় খেতাম, কিন্তু ছেলেবেলায় মানুষ কি না করে, ভরদুপুরে পেয়ারা গাছ থেকে পা উপরে দিয়ে উল্টো হয়ে ঝুলেও থাকতাম। ছেলেবেলায় রুচিও ভালো ছিল, ভাত-মাছ এইসব প্রয়োজনীয় খাবার ছাড়া আর সবকিছু খেতে ভালো লাগত। আম খেয়ে নির্বিকারভাবে রসসিক্ত হাত এবং মুখ গেঞ্জিতে মুছে ফেলতাম। চটচটে হাত-মুখ কিংবা গায়ের কাপড় কখনো আমাকে বিরক্ত করেছে বলে মনে পড়ে না। বাবা-মা নিশ্চয়ই বিরক্ত হতেন, কারণ, মনে আছে শেষ পর্যন্ত উঠানে একটা লম্বা কাপড় বাঁশের ডাগা থেকে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাসায় আইন জারি করে দেয়া হয়েছিল সেখানে হাত মুছতে হবে। কঠোর আইন কিন্তু খুব কাজ হয়েছিল বলে মনে পড়ে না।

আরেকটু বড় হয়ে দিনের বেশির ভাগ সময় গাছে ঝুলে থাকতাম। আমও খাওয়া হত গাছে ঝুলে, হাত চটচটে হলে তখন বিরক্ত লাগা শুরু হয়েছে, তাই আম খাওয়ার জন্যে নতুন কায়দা বের করেছি। আমের ছিলকে না ফেলে শুধু পিছনে একটা ছোট ফুটো করে টিপে টিপে পুরো আমটা সেই ফুটো দিয়ে বের করে চুমে খাওয়া হত। একদিনের কথা মনে আছে, খেতে খেতে হঠাৎ মনে হল, আমের অংশবিশেষ মুখের ভিতর নাড়াচাড়া করছে। সেই বয়সে কোনো জিনিস বেশি গুরুত্ব দেয়ার অভ্যাস ছিল না, তাই প্রথম প্রথম কোনো গুরুত্ব দিলাম না। শেষে কৌতূহলী হয়ে আবিষ্কার করলাম পোকা খাওয়া আম! তার ভিতরে নানা আকারের নানা বয়সী পোকার পরিবার, কিছু খেয়ে ফেলেছি, কিছু খাচ্ছি! আম খাওয়ার আনন্দই মাটি হয়ে গেল।

তরমুজ খাবার কথাও মনে আছে। ঘুমানোর আগে পেট পুরে তরমুজ খেয়ে গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেল। তলপেটে প্রচণ্ড চাপ, বাথরুমে যেতে হবে। একা একা বাথরুমে যাবার কোনো প্রশ্নই আসে না, হঠাৎ করে সবগুলি ভূতের গল্প মনে পড়ে যেতে থাকে। জানলা দিয়ে কাজ সেরে নেবার যে নিরাপদ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলাম সেটি কেন বাসার অন্য লোকজন সহজভাবে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি দীর্ঘদিন আমি সেটা বুঝতে পারিনি।

ছেলেবেলায় শখ করে কোন্ ফলটি খাইনি? সবই খেয়েছি, আম, জাম, লিচু, কাঁঠাল, আনারস, আতা, কামরাঙ্গা, জলপাই, বড়ই থেকে শুরু করে অসংখ্য বুনো এবং আধাবুনো ফল যাদের ভদ্র নাম পর্যন্ত জানি না। একটি ফল কখনোই খুব শখ করে খাইনি, সেটা হচ্ছে কলা। যে ফল সারা বছর পাওয়া যায় সেটাতে আগ্রহ থাকে কেমন করে? সত্যি কথা বলতে কি, কলাটাকে কখনো সত্যিকারের ফল হিসেবেই বিবেচনা করিনি।

মজার ব্যাপার হল যে, বড় হয়ে আবিষ্কার করেছি কলা হচ্ছে একমাত্র সত্যিকারের ভদ্র ফল। যে কোনো ফল খাওয়ার একটা যন্ত্রণা রয়েছে, হয় ধুয়ে খেতে হয় না ছিলকে ফেলে খেতে হয়। ধুয়ে খাওয়া ফলের সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে, কারণ ফলের ফলন বাড়ানো এবং পোকামাকড় থেকে উদ্ধার করার জন্যে আজকাল যেরকম বিষাক্ত ওষুধপত্র দেয়া হয় যে ফলের ছিলকে কে কেউ আর বিশ্বাস করে না। যে সব ফলের ছিলকে ফেলে খেতে হয় তার মাঝেও প্রকারভেদ আছে। কোন কোন ফলের ছিলকে ফেলা রীতিমত যুদ্ধের ব্যাপার (আনারস, নারকেল), কোন কোনটি সহজ (আম, লিচু, কলা)। যেগুলি সহজ তার মাঝেও প্রকারভেদ আছে। ছিলকে ফেলার পর ফলটি রসসিক্ত হয়ে থাকে, হাত দিয়ে ছুঁতে হয় না, অল্প একটু খুলে হাত না ধুয়েই কলাটাকে ধরে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাওয়া যায়। খাওয়া যত এগুতে থাকে ছিলকে তত বেশি খুলে নেয়া যায়, খাওয়া শেষ হলে ছিলকে ফেলে দিলেই হল, হাত চটচটে হবার ভয় নেই, হাত ধোয়ার যন্ত্রণাও নেই। কলার মতো ভদ্র ফল আর কি হতে পারে? যে কোনো পরিবেশে যে কোনো সময়ে খাওয়ার জন্যে এর তুলনা নেই। প্রকৃতি নিজের হাতে একে তৈরি করেছে সভ্য মানুষের জন্যে। সভ্য মানুষ, কারণ কলা খাওয়ার পুরো ব্যাপারটিতে এতটা স্বাস্থ্যসম্মত সভ্য সভ্য ভাব লুকিয়ে রয়েছে।

আমেরিকানদের কলা নামক এই ভদ্র ফলটিকে খেতে দেখে আমার পিলে চমকে উঠেছিল। প্রথমবার ভেবেছিলাম, যে কলাটি খাচ্ছে সে উন্মাদ কিংবা বুদ্ধিভ্রষ্ট কোন মানুষ। কারণ কলাটি হাতে নিয়ে সে একেবারে পুরোটি ছিলে ছিলকেটি ফেলে দিল। তারপর উলঙ্গ কলাটির পেটে চেপে ধরে সেটি খেতে শুরু করল। দৃশ্যটি এত বিসদৃশ যে দেখে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, এটি বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। যে মানুষটি এভাবে কলা খাচ্ছে সে জড়বুদ্ধির কোনো মানুষ, বুদ্ধিবৃত্তি বানরের সমপর্যায়ের, কারণ আমি চিড়িয়াখানায় বানরকেও এভাবে খেতে দেখিনি। কিন্তু আমি কিছুদিনের মাঝেই আবিষ্কার করলাম যে, ঘটনাটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আমেরিকানরা এভাবেই কলা খায়।

কেন খায় আমি সেই রহস্য এখনো ভেদ করতে পারিনি। আমার একাধিক থিওরী রয়েছে কিন্তু কোনোটাই সেই রহস্য উন্মোচন করতে পারেনি। আমি অসংখ্য আমেরিকানকে এই প্রশ্ন করেছি, কেউ সদুত্তর দিতে পারেনি। কেউ মাথা চুলকেছে, কেউ আমতা আমতা করেছে, বেশির ভাগই কেন জানি একটু রেগে উঠেছে কিন্তু কেউই বুদ্ধিবহির্ভূত এই কাজটি ব্যাখ্যা করতে পারেনি। আমার ধারণা এর কোনো ব্যাখ্যা নেই, সবকিছুর ব্যাখ্যা থাকতে হবে কে বলেছে? কান চুলকাতে ভালো লাগে কেন কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পারবে? পরচর্চা করলে এত আনন্দ হয় কেন কেউ কি ব্যাখ্যা করতে পারবে?

খাওয়া নিয়ে যখন কথা উঠেছে আরেকটা গল্প বলি। দেশ থেকে কে একজন আমেরিকা বেড়াতে এসেছেন, তিনি ধর্মমতে জবাই করা হয় না বলে সুপার মার্কেটের গোশত খেতে চান না। এদেশে আজকাল শুটকি মাছ থেকে শুরু করে আগরবাতি পর্যন্ত পাওয়া যায়। ধর্মমতে জবাই করা গোশত পাওয়া যাবে, সেটি

বিচিত্র কি? (এখানে অন্যেরা এটাকে বলে হালাল গোশত, আমি হারাম-হালালের গূঢ় পার্থক্য বিচারে যাই না বলে এটাকে বলি ধর্মমতে জবাই করা গোশত)। শহর থেকে একটু দূরে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দোকানে এরকম গোশত পাওয়া যায়। আমি একদিন গিয়ে কিনে আনলাম। টাটকা গোশত রান্নার মতো। এখানকার বাঙালি সমাজের এক অংশ ধর্মের সব ব্যাপারে উদাসীন হয়েও ধর্মমতে জবাই করা গোশতের প্রতি গভীর প্রীতির রহস্য হঠাৎ করে পরিষ্কার হয়ে গেল!

আমি একদিন ব্যাপারটি কথা প্রসঙ্গে আমার এক আমেরিকান বন্ধুকে জানালাম। বললাম, সুপার মার্কেটের ক্যামিকেল দেয়া গোশত খেয়ে তোমাদের মুখের স্বাদ নষ্ট হয়ে গেছে। টাটকা গোশত একদিন কিনে এনে খেয়ে দেখ, বুঝবে আসল গোশত খেতে কেমন।

ঘটনাক্রমে আমার এই বন্ধুটি ছিল গোশত বিশেষজ্ঞ। ভালো খেতে পছন্দ করে। শিকারের সময় হরিণ শিকার করতে যায় হরিণের মাংসের লোভে। আমার কথা শুনে চোখ ছোট করে বলল, টাটকা?

হ্যাঁ।

মানে?

মাত্র জবাই করে এনেছ।

মাত্র জবাই করে এনেছে?

হ্যাঁ।

বন্ধুটি অবাক হয়ে বলল, মাত্র জবাই করে এনেছে সেই গোশত তোমরা খাও?

খাই।

খেতে পার?

এবারে আমার অবাক হওয়ার পালা। বললাম, কেন? খেতে পারব না কেন?

গোশত শক্ত হবে না?

শক্ত?

হ্যাঁ। গোশত খাবার আগে সবসময় সেটা কয়দিন ফেলে রাখতে হয়। ব্যাকটেরিয়া গোশতটাকে নরম করে দেয়। আমি যখন হরিণ শিকার করি হরিণটাকে অন্তত দুদিন বাইরে ফেলে রাখি।

আমি বললাম, তার মানে গোশতটাকে খানিকটা পাতিয়ে নাও? তুমি যদি জিনিসটাকে এভাবে দেখতে চাও দেখতে পার।

কিন্তু পঁচা মানে কি তাই নয়? ব্যাকটেরিয়া এসে-

হ্যাঁ তাই। কিন্তু এত অবাক হচ্ছ কেন? সুপার মার্কেট থেকে যে গোশত তুমি কিনে এনে খাও সেটা জবাই করার পর কয়দিন রেখে দেয়া হয় তুমি জান না? ব্যাকটেরিয়া গোশতটাকে নরম করে আনে, না হয় কি টেনে ছিঁড়তে পারবে?

পাশে আরেকজন দাঁড়িয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিল। সে হঠাৎ করে বলল, আমি গোশত খাওয়া ছেড়ে দিচ্ছি-

না না না, সেসব কিছু নয়। অন্য ব্যাপার।

কি হয়েছে?

টেলিভিশনে প্রোগ্রাম দেখাচ্ছিল কসাইখানার উপর। ভারি নোংরা মাংশের উপর নাড়িভূড়ি ফেলে দেয়, কেটে কুটে যায় সেসব, ভিতর থেকে ময়লা বের হয়ে আসে, পরিষ্কার করে না মাঝে মাঝে। উয়াক থু–

আমি বললাম, গোশত কাটাকাটি, জবাই ইত্যাদি পুরো ব্যাপারটিই মোটামুটি বীভৎস, দেখার দরকারটি কি ? গোশত খাবার ইচ্ছে হলে খাবে, রান্নার আগে ভালো করে ধুয়ে নিলেই তো হল–

দুয়ে ? বন্ধুটি অবাক হয়ে বলল, ধুয়ে ?

হ্যাঁ, ভালো করে ধুয়ে নিলেই তো হল।

গোশত ধুয়ে নেব ? গোশত আবার ধুতে হয় কখনো শুনেছ ? বন্ধুটি ঠা ঠা করে হাসতে শুরু করে। বলে, কোনদিন আবার বলবে খাবার পানি ভালো করে ধুয়ে নেবে– হা হা হা ---

আমেরিকান বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় খেতে গিয়ে সবসময় গোশতে যে একটা বিদঘুটে গন্ধ পেয়েছি তার রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল হঠাৎ।

আমি তখন নিউজার্সীতে থাকি। হঠাৎ করে শুনি, সেখানে আইন করে দেয়া হয়েছে যে, ডিম পোচ খাওয়া আইনত দণ্ডনীয়। অনেক মানুষ সকালে ডিম পোচ খায়, কাজেই একটা হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। যারা হোটেল রেস্টুরেন্ট চালায় তাদের তো কথাই নেই, কাগজে কাগজে লেখালেখি, বিবৃতি, পাল্টা বিবৃতি, প্রতিবাদ দিতে থাকল। ভাব দেখে মনে হয়, একটা গণ আন্দোলন শুরু হয়ে যায় যায় এরকম অবস্থা, নেহায়েত ধর্মঘট-হরতাল এসব ব্যাপার কেমন করে করতে হয় জানে না বলে ব্যাপারটা সেদিক দিয়ে বেশিদূর এগুতে পারল না। অবশ্যি হৈচৈ করে কাজ হল। সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করে সেই আইন রদ করে দিল, নিউজার্সীর মানুষ আবার ডিম পোচ করে খাওয়া শুরু করল।

কিন্তু ডিম ভাজা নিয়ে আইন ? কারণটা কি? এ তো অনেকটা হবু চন্দ্র রাজার গল্পের মতো, "আইন জারি করে দাও রাজ্যেতে আজ থেকে, কাঁদতে কেহ পারবে না কো যতই মরুক শোকে–"

কারণটা আসলে সহজ। এদেশে মোরগ-মুরগীর গোশত এবং ডিমে বিষাক্ত সালমোনিয়া জীবাণু থাকে। সেটা তাই খুব ভালো করে রান্না করে খেতে হয়। ডিম পোচ করলে ভালো করে রান্না হয় না, কুসুমটা কাঁচা থেকে যায়, যারা খায় তাদের সালমোনিয়া জীবাণু থেকে আক্রান্ত হবার ভয় থাকে। সরকার সাধারণ মানুষজনকে সেই ভয় থেকে রক্ষা করতে চাইছিল, তার বেশি কিছু নয়।

একদিন খুব বড় একটা রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়েছি। নিজের পয়সা খরচ করে কখনো কেউ এরকম রেস্টুরেন্টে খেতে আসে না, আমিও আসি না। বড় এফ কোম্পানি তাদের যন্ত্রপাতি দেখিয়ে আমাদের কয়েকজনকে খেতে এনেছে। ভালো খাওয়ার একটা বড় অংশ হচ্ছে মদ খাওয়া। জিনিসটা খাই না বলে ভালো-মন্দ জানি না। তবে সাথের সবাইকে সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে দেখে মনে হয়েছে, হয়ত আসলেই এর মাঝে কিছু আছে। একজন আমাকে অমূল্য তরলটি এড়িয়ে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করল, তুমি ওয়াইন খেলে না কখনো, তোমার জীবনের তো পঞ্চাশ ভাগই মাটি।

আমি বললাম, ইলিশ মাছের ভাজা খেয়েছ ? নলেন গুড়ে সন্দেশ ? বগুড়ার দই?

আমেরিকান বন্ধুটি থতমত খেয়ে কি একটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, আমি বাধা দিয়ে বললাম, তোমার জীবনের তো নব্বই ভাগই মাটি!

যাই হোক, সেই বড় রেস্টুরেন্টে আমরা যারা খেতে এসেছি তার মাঝে বাঙালি চেহারার শ্যামলা ধরনের একটা মেয়েও আছে। মেয়েটি পাশে এসে বসেছে, কথা বলে বুঝলাম সে শ্রীলংকার মেয়ে। কোন এক অজ্ঞাত কারণে প্রায় সময়েই শ্রীলংকার মানুষজনকে দেখে একেবারে বাঙালির মতো মনে হয়।

খাবার শুরু করার আগে খিদেটা চাগিয়ে নেয়ার জন্যে কিছু একটা খাওয়া হয়, তার মেন্যু দেয়া হল। নানারকম জিনিস রয়েছে সেখানে, তার মাঝে একটা হচ্ছে "সাপ ভাজা"। এদেশে সত্যিকার অর্থে বিষাক্ত সাপ নেই। যে সাপটির কিছু বিষ আছে তার নাম র‍্যাটেল স্নেক। লেজের মাঝে ঝুনঝুনির মতো একটা জিনিস থাকে, কাউকে ভয় দেখাতে হলে সেটা নাড়িয়ে শব্দ করে বলে এর নাম র‍্যাটেল স্নেক। এই সাপটি ভাজা করে খাওয়া হয় জানতাম না, মেন্যু দেখে জানলাম।

শ্রীলংকার মেয়েটি, এতদিনে তার নাম ভুলে গেছি, আমাকে বলল, চল সাপ ভাজা খাওয়া যাক।

আমি বললাম, তোমার খাওয়ার ইচ্ছে করলে খাও। আমি ওসবের মাঝে নেই।

সে কী ? তুমি নতুন জিনিস চেষ্টা করতে চাও না ?

সেটা নির্ভর করে জিনিসটা কি তার উপর। সাপ ভাজা ? কভি নেহী।

খাও খাও। আমি খাচ্ছি। মেয়েটা অনুনয় করে।

তুমি খাও। আমি দেশে ফিরে গিয়ে গল্প করব, একদিন একটা মেয়ের সাথে খেতে বসেছি। তার কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ কচকচ করে একটা সাপ খেয়ে ফেলল। চমৎকার একটা গল্প হবে, কি বল ?

মেয়েটা রুষ্ট দৃষ্টিতে আমাকে এক নজর দেখে সাপ ভাজা অর্ডার দিল। শুধু সে নয়, দলের অনেকেই, আমার মতো একজন-দুজন গেঁয়ো মানুষ ছাড়া।

যথাসময়ে সাপ ভাজা এল দেখে বুঝার উপায় নেই জিনিসটা কি ? দেখে কুমড়া ভাজাও মনে হতে পারে, পটল ভাজাও মনে হতে পারে, মোটেও সাপের মতো কিলবিলে কিছু নয়।

শ্রীলংকার মেয়েটি খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জিনিসটাকে লক্ষ্য করে। তারপর কাঁটায় গেঁথে এক টুকরা তুলে নিয়ে খুব সাবধানে মুখে দিল। মুখটাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে সে জিনিসটা চিবাতে থাকে। তার মুখ দেখে মনে হল না সেটা খুব সুস্বাদু কোনো জিনিস। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি রকম খেতে ?

জিনিসটি সাবধানে গলাধকরণ করে মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, চমৎকার! অনেকটা মুরগীর মাংসের মতো। তুমি খাবে একটু ?

আমি প্রবল বেগে মাথা নাড়লাম, না না না–

খাও না, খেয়ে দেখ। এই যে এক টুকরা। মেয়েটি পারলে জোর করে আমার মুখে এক টুকরা ঢুকিয়ে দেয়।

আমি বললাম, না, না, আমি খাব না, অনেক ধন্যবাদ তোমার আপ্যায়নের জন্য। আমি সাপ ভাজা খাব না। কভি নেহী।

মেয়েটি বিমর্ষ মুখে দ্বিতীয় টুকরাটি মুখে ঢুকিয়ে চিবুতে থাকে। জাবর কাটার মতো দীর্ঘ সময় ধরে চিবিয়ে সেটাও কোন মতে গলাধকরণ করে। তারপর অনেকক্ষণ প্লেটটার দিকে বিষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে তৃতীয় টুকরাটি তুলে নেয়। জিনিসটা খেতে যেরকমই হোক, একসময় সেটা কিলবিলে সাপ ছিল চিন্তা করেই আমার গা গুলিয়ে আসে।

খিদেটা চাগিয়ে নেবার পর এবং মূল খাবার আসার আগে খানিকটা বিরতি থাকে। সেই সময়টাতে সবাই মদ জাতীয় তরল পদার্থ চাখতে থাকে। হালকা গল্প-গুজব হয়। আমি হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, পাশে বসে থাকা শ্রীলংকার মেয়েটি অল্প অল্প কাঁপছে। মুখ ফ্যাকাসে, ঠোঁট শুকনো এবং কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে তোমার?

খুব শরীর খারাপ লাগছে।

শরীর খারাপ লাগছে কেন?

জানি না। মনে হয় সাপ ভাজা খেয়ে। এরকম একটা জিনিস খাওয়া মনে হয় ঠিক হল না।

আমি সাহস দিলাম, বললাম, 'সাপের বিষ তো খাওনি, সাপের মাংস খেয়েছ। তা ছাড়া সাপের বিষ রক্তে মিশে গেলে সমস্যা কিন্তু খেলে নাকি ক্ষতি হয় না, হজম হয়ে যায়।

মেয়েটি চোখ উল্টিয়ে বলল, মনে হয় ফিট হয়ে যাব আমি। কী লজ্জার কথা-

আমি বললাম, লজ্জার কিছু নেই। হতে চাইলে হয়ে যাও। আমরা সবাই মিলে সামলে নেব। চিন্তা করে দেখ কি চমৎকার একটা গল্প হবে-

মেয়েটা লাল চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, মনে হয় বমি করে দেব।

আমি নিরাপদ দূরত্বে সরে গিয়ে বললাম, করতে হলে করবে, কি আছে! মনে হয় যদি বাথরুমে গিয়ে কর, ব্যাপারটা ভালো দেখাবে।

বাথরুম?

হ্যাঁ। যেতে পারবে?

মনে হয় পারব। সে সাবধানে উঠে দাঁড়াল। মুখ একবার বিকৃত করল, মনে হল উপস্থিত প্রায় পনের জনের উপর হড় হড় করে বমি করে দিয়ে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করে ফেলবে। আমি চোখ বন্ধ করলাম কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টি হল না। মেয়েটি টলতে টলতে বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেল।

খাবার এল একটু পর। চমৎকার খাবার, খুব শখ করে খেলাম আমরা। এদেশের খাবার রান্না করতে যেটুকু সময় ব্যয় করা হয় তার থেকে বেশি সময় ব্যয় করা হয় সেটাকে সুন্দর করে পরিবেশন করার মাঝে। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। হৈচৈ করে সেই চমৎকার খাবার আমরা যখন খাচ্ছি, তখন শ্রীলংকার সেই দুঃসাহসী মেয়েটি তার পানির গ্লাসে এক টুকরা লেবু ছেড়ে দিয়ে সেই পানিটি খেল।

খুব সাবধানে। আর এক টুকরা খাবারও নয়! ব্যক্তিগত জিনিস জিজ্ঞেস করা ঠিক নয়, তবু আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, বমি হল বাথরুমে?

হুঁ।

সাপ বেরিয়ে এসেছে পুরোটুকু?

মেয়েটি লাল চোখে আমার দিকে তাকাল, উত্তর দিল না।

সাপ খাওয়ার গল্প যখন হচ্ছে তখন কেঁচো খাওয়ার একটা গল্প বলি। এটি দেশের ঘটনা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলের ছাত্র। ডাইনিং হলে বসে খাচ্ছি, শিং মাছের ঝোল রান্না হয়েছে। পাশে একজন বসে খাচ্ছে, তাকে আমি ভালো চিনি না। হঠাৎ খাওয়া থামিয়ে শিং মাছের মাথাটি আমাকে দেখাল, দেখছ?

কি?

সে সাবধানে মাথাটা থেকে একটা বড়শী খুলে আনল, বলল, শিং মাছের মুখের বড়শীটা পর্যন্ত খুলেনি। কি রকম কাজ কারবার! মানুষ মারার ফন্দি!

বড়শীটা টেবিলে রেখে সে শিং মাছের মাথাটা মুখে পুরে দিল। আমি বললাম শিং মাছ ধরার জন্যে টোপ কি ব্যবহার হয় জান?

কি?

কেঁচো। দেখি তো টোপটা কি, এখনো লেগে আছে কি না?

আমি বড়শীটা তুলে নিলাম, পুরুষ্ট খানিকটা কেঁচো তখনো লেগে আছে সেখানে। তেল-মশলা দিয়ে রান্না হয়ে গেছে কিন্তু সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

ছেলেটা মুখ থেকে থু থু করে সব খাবার তার প্লেটের মাঝে ফেলে দিয়ে এক লাফে উঠে দাঁড়াল!

কিছু কিছু মানুষ খাবারের ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর হয়!

কথা বলার ব্যাপারটাকে আমরা আমাদের জন্মগত অধিকার বলে ধরে নেই। ব্যাপারটায় যে কোনো ধরনের গুরুত্ব আছে সেটা বুঝা যায় যখন আমরা কোনো এক দেশে গিয়ে সেই দেশের ভাষায় কথা বলতে না পারি, তখন। ঠেলে-ঠুলে যেভাবে হোক ইংরেজিটা আজকাল কোনোভাবে বলে ফেলতে পারি, পৃথিবীর সব দেশেই আজকাল কিছু মানুষ পাওয়া যায় যারা ইংরেজি খানিকটা হলেও বোঝে। একবার কর্সিকা নামে এক দ্বীপে গিয়ে আবিষ্কার করলাম, সেখানে ইংরেজিতে কথা বলে সেরকম মানুষ বলতে গেলে নেই। মূল ফ্রান্স থেকে বিচ্ছিন্ন বলে না অন্য কোনো কারণ আছে আমার জানা নেই। এরকম স্থান খুব বিপজ্জনক, পুরোপুরি অনাহারে মারা যাবার সম্ভাবনা আছে। আমি তাই আমার দল থেকে কাছছাড়া হই না। একজন ফ্রেঞ্চ ভাষা জানে, আমাদের হয়ে কথাবার্তা বলে রেস্টুরেন্টে মেন্যু অনুবাদ করে দেয়।

সেভাবেই বেশ চলছিল, এর মাঝে একদিন একটা ছোট ঝামেলা হল। কর্সিকার সমুদ্রোপকূল খুব সুন্দর! ছোট শহরের মাঝ দিয়ে ইট বাঁধানো রাস্তা চলে গেছে, দু' পাশে আঙুর গাছ আর রকমারী ফুল। হেঁটে হেঁটে সমুদ্রতলে যাওয়া যায়। আমি একদিন ক্যামেরা নিয়ে বের হলাম সূর্যাস্তের ছবি তুলতে। অসম্ভব সুন্দর

সমুদ্রতট, সুন্দর একটা জায়গা বের করে ক্যামেরা নিয়ে বসে আছি। সূর্য নিচে নেমে অতিকায় একটা মস্তরের ডালের মতো আকার নিয়ে টুপ করে ডুবে গেল। আমি বেশ কয়েকটা ছবি নিয়ে আবার নির্জন রাস্তা ধরে ফিরে এলাম। ফিরে এসে আবিষ্কার করলাম, দলের সবাই খেতে বের হয়ে গেছে।

ছোট শহর কিন্তু অনেকগুলি রেস্টুরেন্ট, তারা কোথায় খেতে গেছে বের করার কোন উপায় নেই। আমি তবু ইতস্তত একটু চেষ্টা করে একসময় হাল ছেড়ে দিয়ে সাহসে বুক বেঁধে একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে গেলাম। একজন আমাকে বসিয়ে দিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। আমি মেনুটা হাতে নিয়ে নানাভাবে দেখছি। ফরাসি ভাষায় দুটি শব্দ শিখেছি, সেই দুইটি নানা জায়গায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে থাকি! ওয়েটার আসার পর তাকে কি বলব চিন্তা করে আমার কাল ঘাম ছুটে যাচ্ছে। ঠিক তখন দৈব যোগাযোগ ঘটে গেল, পাশের টেবিলে যে দুজন বসেছিল ওয়েটার এসে তাদের খাবার দিয়ে গেল, ধূমায়িত শিক কাবাব, একেবারে পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ কুচিসহ! আমার ওয়েটার এলে আর কোনো সমস্যা নেই, হাত দিয়ে শুধু দেখিয়ে দেব ঐ জিনিস আর কিছু বলতে হবে না।

আমি ধৈর্য ধরে বসে থাকি। কিন্তু ওয়েটারের আর দেখা নেই। ফ্রেঞ্চ রেস্টুরেন্টের এই নাকি সমস্যা, খাবারের দাম অনেক বেশি, কারণ ধরে নেয়া হয়, যে খেতে এসেছে সে তার বসার জায়গাটি সারা রাতের জন্যে ভাড়া নিয়ে নিয়েছে। পারতপক্ষে তাকে বিরক্ত করা হয় না, আমি আমার জায়গা ভাড়া করে বসে আছি এবং কেউ আমাকে বিরক্ত করছে না। আড়চোখে পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তাদের খাবার প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে, আর একটু দেরি হলে হাত দিয়ে দেখানোর মতোও কিছু অবশিষ্ট থাকবে না।

তখনো ওয়েটারের দেখা নেই, আমি ঘন ঘন তাকাচ্ছি, চেহারায় একটা ব্যস্ততার ভাব ফোটানোর চেষ্টা করছি কিন্তু কোনো লাভ হল না। ওয়েটারের কোনো দেখা নেই, আমি করুণ চোখে তাকিয়ে রইলাম এবং পাশের টেবিলের দুজন কপাৎ করে শিক কাবাবের শেষ টুকরাটি গলাধকরণ করে নিল।

শেষ পর্যন্ত আমার ওয়েট্রেস যখন এসেছে তখন পাশের টেবির পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, শিক কাবাবের কোনো চিহ্ন নেই। দুজন চুক চুক করে কফি খাচ্ছে। ওয়েট্রেসের উপর রাগ করা যায় না, বিশেষ করে সে যদি সুন্দরী এবং কমবয়সী ফরাসি ললনা হয়। মেয়েটি মিষ্টি হাসি হেসে কল কল করে অনেক কিছু বলে ফেলল, কথা বলার ভঙ্গি থেকে আমি বুঝতে পারলাম, সে নিশ্চয়ই বলছে, কী চমৎকার এই সন্ধ্যেটি, কী অপূর্ব আজকের আবহাওয়া, এই সুন্দর সন্ধ্যেবেলায় যদি আনন্দ না কর কখন করবে আনন্দ ? আমি একটু দেঁতো হাসি হেসে মাথা ঝাঁকালাম, যার অর্থ, অবশ্যি অবশ্যি, তুমি ঠিকই বলেছ।

সৌজন্যের কথা বিনিময়ের পর কাজের কথা শুরু হল। এপ্রনের পকেট থেকে ছোট নোট বইটা বের করে পেন্সিল হাতে নিয়ে আমার দিকে নীল চোখে তাকিয়ে আবার কল কল করে অনেক কিছু বলল। এবারে নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে আমি কি খেতে চাই।

আমি মরিয়া হয়ে পাশের টেবিলের সেই দুজনের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বুঝানোর চেষ্টা করলাম, ওরা যেটা খেয়েছে আমি সেটা খেতে চাই। জিনিসটা সহজ নয়, যার বিশ্বাস হয় না ইশারায় সেটা বুঝানোর চেষ্টা করে দেখতে পারেন। বলা বাহুল্য, মেয়েটি আমার ইশারা বুঝল না, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার কথা বলা শুরু করল। এবারে কথা বলল ধীরে ধীরে এবং প্রত্যেকটা শব্দের মাঝে জোর দিয়ে। আমি আগেও লক্ষ্য করেছি, অনেকেই মনে করে ধীরে ধীরে জোর দিয়ে উচ্চারণ করলেই ভাষার ব্যবধানটা যেন কাটিয়ে নেওয়া যায়! মেয়েটা কথা শেষ করার পর আমি আবার পাশের টেবিলটা দেখালাম, খাওয়ার মতো একটা মুখভঙ্গি করলাম।

পাশের টেবিলের ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা এবারে আমার দিকে তাকালেন, আমি কাতর দৃষ্টিতে তাঁদের দিকে তাকিয়ে আবার নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে থাকি। ক্ষুধায়ও মানুষ মরিয়া হয়ে গেলে অনেক কিছু করতে পারে। আমি দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে নানারকম অঙ্গভঙ্গি করতে থকি। আমাদের ঘিরে একটা ছোটখাট ভিড় জমে যায় এবং হঠাৎ করে একজন বুঝে ফেলে আমি কি বলতে চাইছ। সে ফরাসি ভাষায় সেটি বলে দিল এবং দেখতে পেলাম সবাই সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। পাশের টেবিলের দুজনও উঠে এসে আমার মেন্যুতে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন তারা কি অর্ডার করেছেন, ওয়েট্রেস মেয়েটি সেটা এক নজর দেখল, তারপর ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকিয়ে যেটি করল সেটি বিচিত্র।

প্রথমে একবার না-সূচক মাথা নাড়ল, তারপর আমার দিকে পিছন ফিরে তার সুডৌল নিতম্বটি নাচিয়ে হাত দিয়ে সেখানে একটি থাবা দিল। তারপর ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে দুই হাত নেড়ে কলকল করে অনেক কথা বলে গেল যার কিছুই আমি বুঝতে পারলাম না। মেয়েটি আমাকে কিছু একটা বুঝাতে চাইছে, সুডৌল নিতম্বটি আমাকে দেখিয়ে সেখানে থাবা দেয়ার সাথে তার কিছু একটা সম্পর্ক আছে, কিন্তু সেই সম্পর্কটি আমার মোটা মস্তিক কিছুতেই ধরতে পারল না। আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আবার ঘুরে পিছন ফিরে তার নিতম্বে থাবা দিয়ে আমার দিকে কঠিন প্রশ্নের একটা ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি কিছু বুঝতে পারছি না দেখে সে খানিকটা অসহিষ্ণু হয়ে আবার পিছন ফিরে তার নিতম্বে চপেটাঘাত করল, মনে হল বেশ জোরেই।

এরকম অবস্থায় যা করতে হয় আমি তাই করলাম। মুখে একটা দেঁতো হাসি ফুটিয়ে বোকার মতো মাথা নাড়তে লাগলাম, যার একমাত্র অর্থ, চমৎকার তোমার সুডৌল নিতম্ব, সেখানে হাত দিয়ে থাবা দেবার ভঙ্গিটিও অপূর্ব। কিন্তু আমার শিক কাবাবের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি শিককাবাব নিয়ে এস যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মেয়েটা আরো খানিকক্ষণ চেষ্টা করে মুখে স্পষ্ট হতাশার ভঙ্গি ফুটিয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে চলে গেল।

আবার আমি একা একা দীর্ঘ সময় বসে রইলাম। গরুর হাট থেকে গরু কিনে এনে জবাই করে মাংস কেটেকুটে শিক কাবাব বানাতে যে পরিমাণ সময় লাগার

BDeBooks.com

কথা প্রায় সেরকম সময় লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েটি খাবার নিয়ে এল। ধূমায়িত শিক কাবাব, সাথে পেয়াঁজ এবং কাঁচামরিচ কুচি। দেখে আমার মুখে পানি এসে গেল সাথে সাথে। কাঁটায় গেঁথে খেতে গিয়ে আমি হঠাৎ চমকে উঠলাম। এটা তো শিক কাবাব নয়, শিক কাবাবের মতো তৈরি করা একটি জিনিস। কোনো প্রাণীর কিডনী, চাক চাক করে কেটে আগুনে ঝলসে নিয়েছে। কোন প্রাণী ?

হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম, ফরাসি ললনা তার নিতম্বে থাবা দিয়ে কি বুঝানোর চেষ্টা করছিল। কিডনী থাকে কোমর এবং নিতম্বের মাঝামাঝি, মেয়েটি সেখানে থাবা দিয়ে বলতে চাইছিল এটা কিডনী, মাথা নেড়ে বলতে চাইছিল তুমি এটা খেতে পারবে না।

আমি সত্যি খেতে পারিনি। শুকনো রুটি চিবিয়ে বড় দুই গ্লাস পানি খেয়ে ডিনার শেষ করে ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে এলাম।

আমি যেখানে কাজ করি সেখানকার ক্যাফেটারিয়ার খাবার বেশি সুবিধের নয়। সত্যি কথা বলতে কি– আমার ধারণা, পৃথিবীর কোনো ক্যাফেটারিয়ার খাবারই বিশেষ সুবিধের নয়। সেটা নিয়ে কখনো কেউ মাথাও ঘামায় না। কাজ করতে এসে দুপুরে কিছু খেতে হয়, তাই খাওয়া হয়, এর বেশি কিছু নয়। সেই খাওয়া নিয়ে হৈচৈ করলে লাভ কি ? এক সাথে বসে গল্প-গুজব, পরচর্চা করে খাওয়া হয়। খাবার যত খারাপই হোক, লোকজন সেটা খেয়ে নেয়। ইদানীং মানুষ খাবার সম্পর্কে খুব সচেতন হয়েছে, সবাই বেশিরভাগ সময় যে জিনিসটি খায় সেটা হচ্ছে সালাদ। "সালাদ বার" বলে খানিকটা জায়গা আলাদা করা আছে, সেখানে নানারকম কাঁচা শাকসবজী, ফলমূল, ছোলা, কটেজ চীজ, এক–দু'রকম নুলে ইত্যাদি রাখা হয়। লোকজন এসে বাটি ভরে তুলে নিয়ে খায়। শখ করে খায় বলব না, নিয়ম করে খায়, আমেরিকার মানুষজন নিয়মের খুব ভক্ত।

আমাদের ক্যাফেটারিয়াতে দু'রকমের বাটি রাখা আছে, ছোট বাটি এবং বড় বাটি। ছোট বাটি ভরে নিলে এক ডলার, বড় বাটি ভরে নিলে দুই ডলার। যারা নেয় সবাই বাটি ভরে নেয়, খামাখা পয়সা খরচ করে কম নেবে কেন ? একজন শুধু আছে যে শুধু বাটি ভরে নেয় না, বাটি ভরার সময় এমনভাবে ভরে নেয় যে সেটা পৃথিবীর যাবতীয় বাটি ভরার রেকর্ড ভেঙে ফেলে দেয়। তার বাটি ভরার প্রক্রিয়াটি একটি দর্শনীয় দৃশ্য। মোটামুটি লাজলজ্জাহীন গোমড়া মুখের এই মানুষটি দীর্ঘ সময় নিয়ে তার বাটিটি ভরে। প্রথমে লম্বা গাজর দিয়ে বাটির চারপাশে একটা উঁচু দেয়াল তৈরি করে বাটির সাইজটি চারগুণ বাড়িয়ে ফেলে। তারপর মাঝখানে অন্য খাবার ঠেশে ভরা শুরু করে। প্রথমে তারপর আনারসের টুকরা, তার ওপর কটেজ চীজ, তার উপর টমেটো এবং ফুলকপির টুকরা, তার উপর অন্যান্য ফলমূল। ভরে নেবার পর সালাদ পাহাড়ের চূড়ার মতো উঁচু হয়ে উঠে। তখন সে অতি বসাবধানে সেটাকে কাউন্টারে নিয়ে যায়।

কাউন্টারের মেয়েটি এই বিশাল সালাদের পর্বতের জন্যে মাত্র এক ডলার নেয়। সালাদের পাহাড় যত বিশালই হোক না কেন, যে বাটির উপর সেটা দাঁড়া করানো হয়েছে সেটা ছোট বাটি, তার জন্যে এক ডলারের বেশি নেয়ার নিয়ম নেই।

কেউ যদি একদিন একটা কাজ করে সেটাকে একটা কৌতুক বলা যায়। যদি বেশ কয়জন মিলে একসাথে একবার এটা করে সেটাকে রসিকতা হিসেবে ধরা যায় কিন্তু যখন একজন মানুষ প্রতিদিন একই ব্যাপার করতে থাকে তখন সেটা কৌতুক বা রসিকতা থাকে না, মোটামুটিভাবে নিচুস্তরের কার্পণ্যতার পর্যায়ে চলে যায়। প্রায় সব মানুষের স্বভাবের মাঝেই কোনো না কোনো দুর্বলতা থাকে, মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে সেই দুর্বলতাটাকে ঢেকে রাখতে। সম্ভবত সভ্যতার সেটা হচ্ছে প্রথম শিক্ষা। এই মানুষটি তার কার্পণ্য নামক দুর্বলতাটি ঢেকে রাখার কোনো চেষ্টা করে না, সেটা নিয়ে মনে হয় তার কোনো লজ্জাও নেই। কাজেই তাকে প্রতিদিন এক ডলার দিয়ে একটা সালাদের পাহাড় নিয়ে বের হয়ে যেতে দেখে সবার যে গা জ্বালা করে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এর মাঝে একদিন সিদ্ধান্ত নেয়া হল যে, এখন থেকে সালাদ ওজন করে বিক্রি করা হবে। বেশি নিলে বেশি দাম, কম নিলে কম। সালাদ ওজন করার জন্য বিশেষ ব্যালেন্স লাগানো হল, উপরে বাটি রাখা হলে বাটির ওজন বাদ দিয়ে সালাদ ওজন করে সোজাসুজি দামটা বের করে নেয়া হবে।

ঈশ্বরের বিশেষ হস্তক্ষেপের কারণে গোমড়ামুখী লোভী মানুষটি এই পরিবর্তনটির কথা জানল না।

এর পরের ঘটনা কাফেটারিয়ার মানুষজন দীর্ঘদিন মনে রাখবে। লোকটি তার সালাদের পর্বত নিয়ে বের হবার জন্যে কাউন্টারের মেয়েটির হাতে একটা ডলার ধরিয়ে দিতেই মেয়েটি হাসিমুখে বলল, আজ থেকে নতুন নিয়ম! ওজন করে পয়সা। গোমড়ামুখী মানুষটার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, –ও–ওজন করে?

হ্যাঁ। দেখ না নতুন ব্যালেন্স লাগানো হয়েছে, বাটিটা রাখ, দাম উঠে যাবে। বাটির ওজন প্রোগ্রাম করা আছে, নিজে নিজে বাদ দিয়ে দেবে।

গোমড়ামুখী লোকটা কাঁপা কাঁপা হাতে সালাদের বিশাল পর্বতটি ব্যালেন্সের উপর রাখল।

কাউন্টারের মেয়েটির মুখে হাসি আর ধরে না। খুশিতে ঝলমল করে বলল, নতুন রেকর্ড হয়েছে! এক বাটি সালাদ আঠার ডলার তেতাল্লিশ সেন্ট!

আ–আ–আ– আঠারো ডলার ?

হ্যাঁ, আঠার ডলার তেতাল্লিশ সেন্ট।

গোমড়ামুখী মানুষটি কাঁপা হাতে তার মানিব্যাগ বের করে টাকা বের করে দেয়। প্রাণ ছিঁড়ে যাচ্ছে কিন্তু উপায় কি ? ক্যাফেটারিয়ার অসংখ্য মানুষ যদি ভদ্রতার বাঁধনটুকু আলগা করত তাহলে অট্টহাসির শব্দে পুরো শহর কেঁপে উঠত।

কিন্তু কেউ হাসল না। শুধু হাসি হাসি মুখে গোমড়ামুখী মানুষটিকে তার সালাদের পর্বতটিকে সাবধানে সামলে নিয়ে যেতে দেখল!

১৯৯২

হার্ব হেনরিকসন

আমি দীর্ঘদিন থেকে আমেরিকায় আছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমার অসংখ্য আমেরিকানদের সাথে পরিচয় হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, অল্পবিস্তর অন্তরঙ্গতা হয়েছে। কিন্তু আমার সত্যিকার আমেরিকান বন্ধু মাত্র একজন। বন্ধু বললেই অনেকের চোখের সামনে "আবে শালা" কারো ঘাড়ে থাবা মারার দৃশ্য ফুটে উঠে। আমার বন্ধুর বেলা সেটি প্রযোজ্য নয়, আমি কখনো তার ঘাড়ে "আবে শালা" বলে থাবা মারিনি। তার বয়স পয়ষট্টি বৎসর। আমার সাথে যখন তার পরিচয় হয়েছিল তখন তার বয়স ছিল আমার দ্বিগুণ। আমার এই বন্ধুটির নাম হার্ব হেনরিকসন। ক্যালিফোরনিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে আমরা দুজন দীর্ঘদিন একসাথে কাজ করেছিলাম, কাজ করে এত আনন্দ আমি জীবনে আর কখনো পাইনি। হার্ব সম্ভবত পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ারদের একজন। কিন্তু আনন্দ সে কারণে নয়, আনন্দ এই মানুষটির বিচিত্র স্বভাবটির জন্যে। একটু খুলেই বলি–

আমি হয়ত করিডোর ধরে হেঁটে যাতি আমাকে দেখে হার্ব বলল, মাথায় দেখি চুলের জঙ্গল হয়েছে।

হ্যাঁ। কাটার সময় পাচ্ছি না।

আস আমার অফিসে।

হার্বের অফিসটি খোলামেলা, ঘরে নানা শেলফে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি, পিছনে ড্রাফটিংয়ের টেবিল। ঘরের দেয়ালে চারপাশে অসংখ্য তেলরঙা ছবি, সবই তার স্ত্রীর আঁকা। ভদ্রমহিলা সত্যিকারের আর্টিস্ট, যৌবনে ছবি এঁকেছেন, আজকাল আর আঁকেন না। হার্ব উঁচু টুলটা এগিয়ে দিয়ে বলল, বস।

আমি টুলে পা মুড়ে বসি। হার্ব ড্রয়ার থেকে মিকি মাউসের ছবি আঁকা এক টুকরা কাপড় বের করে আমার শরীরে পেঁচিয়ে নেয়। নিজে একটা সাদা ওভার ওল পরে নিয়ে অন্য ড্রয়ার থেকে কাঁচি–চিরুনী এবং ইলেকট্রিক ক্লীপার বের করে।

মাথার চুল চিরুণী দিয়ে সোজা করতে করতে বলে, তোমার চুলের যে অবস্থা কোনোদিন চিরণী পড়েছে বলে মনে হয় না। ধরা যাক, তুমি কোনোদিন চুল আচড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলে, তাহলে কোন্‌দিকে সিঁথি করবে?

আমি হার্বের কথায় কখনো কিছু মনে করি না। বললাম, বাম দিকে।

হার্ব চুল পার্ট করে কাটা শুরু করে দেয়। অবিশ্বাস্য নিপুণ হাত। পুরুষমানুষ মাত্রকেই চুল কাটার ভয়াবহ অভিজ্ঞতা দিয়ে যেতে হয়, সারা জীবন অসংখ্য নাপিতের সাথে সেইসব ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হার্বের হাতের স্পর্শে একেবারে ভুলে যাওয়া সম্ভব। নেভীতে কাজ করার সময় সবাইকে এক ধরনের "বাটি ছাট" দেয়া হত, সেটা কারো পছন্দ হত না। সহকর্মীদের সেই ভয়ঙ্কর "বাটি ছাট" থেকে

উদ্ধার করার জন্যে সে চুল কাটা শুরু করেছিল, সেই থেকে অভ্যাস। আজকাল সে এত ভালো চুল কাটতে পারে যে ছেলেদের কথা ছেড়ে দিলাম, মেয়েরা পর্যন্ত তাদের হেয়ার ড্রেসার ফেলে হার্বের কাছে চুল কাটাতে চলে আসে। সে নিজে তার নিজের চুল কাটতে পারে না সেজন্যে যেতে হয় এক সত্যিকার নাপিতের কাছে, সে সেই নাপিতের চুলও কেটে আসছে গত কুড়ি বছর থেকে।

কিন্তু চুল কাটা তার শখ হতে পারে সেটা তার পেশা নয়। পেশায় সে ইঞ্জিনিয়ার, চুল কাটতে তাই আমাদের কাজের কথা শুরু হয়। আমি বলি, হার্ব, ফিল্ড রিংগুলি তামার সরু টিউব দিয়ে তৈরি করলে কেমন হয়?

তামার টিউব কেন?

রিং বানানো সোজা।

সেজন্যে বানাতে চাইছ না কি অন্য কোনো কারণ আছে?

অন্য কারণ নেই, বানানো সোজা।

হার্ব চুল কাটা বন্ধ করে আমার দিকে তাকায়, বলে, কোন্‌টা সোজা কোন্‌টা কঠিন সেটা নিয়ে তুমি কখনো মাথা ঘামাবে না। সেটা নিয়ে মাথা ঘামার আমি। তুমি শুধু বলবে তুমি কি চাও। ধরে নাও, তোমার কাছে আলাদীনের প্রদীপ, যা চাইবে তাই পাবে। বল তুমি কি চাও। আমাকে একেবারে তোমার মনের ইচ্ছেটি খুলে বল।

আমি তখন একগাল হেসে আমার একেবারে মনের ইচ্ছেটি খুলে বলি। যে এক্সপেরিমেন্টটি আমি দাঁড়া করানোর চেষ্টা করছি, তার খুঁটিনাটি আমি কেমন করে চাই। অসম্ভব অসম্ভব জিনিস আমি দাবি করি, যান্ত্রিক জটিলতায় যা তৈরি করার কোনো সম্ভাবনাই নেই। হার্ব চুল কাটতে কাটতে মাঝে মাঝে থেমে গিয়ে আমাকে প্রশ্ন করে, তারপর আবার চুল কাটতে শুরু করে।

সাধারণত দু'–তিনদিন পর সে আমার কাছে হাজির হয়। একগাল হেসে বলে, রাত তিনটের সময় গত রাতে আমার ঘুম ভেঙে গেল, বয়স হয়ে গিয়েছে, আর ঘুম আসতে চায় না!

তাই নাকি? আমি খুব খুশি হয়ে উঠি, হার্বের রাত তিনটের সময় ঘুম ভেঙে যাওয়া সাধারণত সুখবর।

ছাদের দিকে তাকিয়ে একঘণ্টা পার হবার পর হঠাৎ করে মনে হল, তুমি যেটা চাইছ সেটা কীভাবে করা যায়।

যান্ত্রিক জটিলতার কারণে যে জিনিসটা আমার কাছে পুরোপুরি অসম্ভব এবং অবাস্তব একটি দাবি মনে হয়েছিল হার্ব সাধারণত তার শতকরা পচানব্বই ভাগ সমাধান করে ফেলত। এবং তার সব সমাধান হত ভোররাতে ঘুম ভেঙে বিছানায় শুয়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে।

ক্যালটেকে আমি যে এক্সপেরিমেন্ট দাঁড়া করানোর চেষ্টা করছিলাম সেটি ছিল সত্যিকার অর্থে একটি জটিল এক্সপেরিমেন্ট। টাইম প্রজেকশান চেম্বার, সংক্ষেপে টি. পি. সি. নামে এক ধরনের ডিটেক্টর দিয়ে চার্জড পার্টিকেলের এক ধরনের ইলেকট্রনিক ছবি তোলা যায়। অসংখ্য ইলেকট্রনিক্‌স চ্যানেল খানিকটা

সময়-নির্ভর তথ্য ধরে রাখে, কম্পিউটার দিয়ে সেই তথ্য বিশ্লেষণ করে ছবিটি তৈরি করা হয়। পৃথিবীতে টি. পি. সি. খুব বেশি নেই, আমাকে একটা টি. পি. সি. তৈরি করতে হবে, এবং সেটা তৈরি করতে হবে বিশেষ একটি গ্যাস ব্যবহার করে, যেটি হবে পৃথিবীর প্রথম। টি. পি. সি.-র ভিতর জিনন নামের একটি দুষ্প্রাপ্য গ্যাসের যে বিশেষ আইসোটোপ ব্যবহার করা হবে সেটি কিনতে দুশ পঞ্চাশ হাজার ডলার খরচ পড়বে, অন্য সব কিছু তো ছেড়েই দিলাম। বড় কথা হল, আমি যখন এই দায়িত্ব নিয়ে যোগ দিয়েছি তখনো কেউ জানে না এই ধরনের টি. পি. সি. তৈরী করা আদৌ সম্ভব কি না!

আমি তখন নতুন পিএইচ. ডি. শেষ করেছি, অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই, এত বড় দায়িত্ব নিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছি। সহকর্মীরা মোটামুটি আমাকে গাধা হিসেবে ধরে নিয়েছে, এ না হলে এরকম অসম্ভব একটা প্রজেক্ট হাতে নিয়ে কেউ কাজে যোগ দেয় না। আমার সাথে কাজ করতে এল দুজন ছাত্র-ছাত্রী, সবাই তাদেরকেও গাধা হিসেবে ধরে নিল। মোটামুটি সবাই জানত, বছর দুয়েক চেষ্টা-চরিত্র করার পর আমরা ছেড়েছুড়ে দিয়ে কেটে পড়ব।

আমি অবশ্যি কেটে পড়লাম না, ধৈর্য ধরে লেগে রইলাম। আমার সাথে হার্ব। পদার্থবিজ্ঞানের সমস্যাগুলি সমাধান করলাম আমি, ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যাগুলি হার্ব। ছোট খেলনার মতো একটা টি. পি. সি. তৈরি করা হল। সমস্যাগুলি বুঝার জন্যে সব দেখে শুনে একদিন সাপ্তাহিক মিটিংয়ে আমি প্রফেসরকে জানালাম যে আমি টি. পি. সি. তৈরি করতে প্রস্তুত।

শুনে সবাই হৈ-হৈ করে উঠল, বলল, ছোটখাট একটা দাঁড়া করাও আগে-

আমি বললাম, গবেষণা হচ্ছে নৌকা বাইচের মতো, যে আগে যায় সে জিতে। এখানে ছোটখাট জিনিস তৈরি করে সময় নষ্ট করা ঠিক না।

কিন্তু এত বড় একট জিনিস? কয়েক মিলিওন ডলার খরচ। আগে ছোটখাট একটা তৈরি না করে-

পরীক্ষা-নিরীক্ষা যা করার আমি করেছি। আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না, আসল জিনিসে হাত দিতে চাই।

হার্ব, হার্ব, তুমি কি বল?

হার্ব কপালে হাত ঠুকে বলল, জাফর যা বলে তাই!

দলের ঘোর অবিশ্বাসীরা প্রায় লাফিয়ে উঠে। চিৎকার করে বলে, ইলেকট্রনিক্স? চারশ চ্যানেলের ইলেকট্রনিক্স? কোথাও কিনতে পাবে না, সব তৈরি করতে হবে। কে তৈরি করবে? এক সেকেন্ডে যত ডাটা হবে সেটা নেয়ার মতো কোনো কম্পিউটার নেই-

হবে হবে, সব হবে।

কেমন করে হবে?

সব আমি তৈরি করব।

তুমি? তুমি নিজে চারশ চ্যানেলের ভিজিটাল আর এনালগ ইলেকট্রনিক্স তৈরি করবে?

অসুবিধে আছে?

কেউ সোজাসুজি কিছু বলতে পারল না। কেউ অবশ্যি জানেও না যে, আমার জীবনে আমি ইলেকট্রনিক্সের কোনো কোর্স নিইনি। যা শিখেছি পুরোপুরি নিজের শখে। বলা যেতে পারে, আমি বাঙালি হাসির গল্পের সেই নাপিতের মতো, জ্ঞানের গভীরতা নেই বলে যে অবলীলায় দুঃসাধ্য অস্ত্রোপাচার করে ফেলত। জিনিসটি কত কঠিন, কত শ্রমসাধ্য ধারণা নেই বলে নিজে নিজে করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি!

সবাই যতই বিরোধিতা করুক, আমাদের প্রফেসর আমাকে বড় টি. পি. সি. তৈরি করার অনুমতি দিলেন। আমি আর হার্ব মিলে অসম্ভব একটা জটিল যন্ত্র তৈরি করার কাজে লেগে গেলাম। কাজ ভাগাভাগি করে নেয়া হল। কি করা হবে আমি ঠিক করি, কীভাবে করা হবে ঠিক করে হার্ব। ইলেকট্রনিক্স সে জানে না, তার পুরো দায়িত্ব আমার। পুরো ডিজাইন করে কিছু কম বয়সী ছাত্রকে সেল্‌ডোরিং করতে লাগিয়ে গিয়েছি। কম্পিউটারের অংশবিশেষ করবে কানে দুল পরা কিছু আন্ডার গ্রাজুয়েট ছাত্র। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে কাজ এগুতে থাকে।

হার্বকে নিয়ে কাজ করা একটি অপূর্ব অভিজ্ঞতা, একজন মানুষের যে এত অবিশ্বাস্য দক্ষতা থাকতে পারে নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অসম্ভব নিপুণ জিনিস সে তৈরি করেছিল, সেই সব নিপুণ জিনি তৈরি করার জন্যে সে তৈরি করেছিল আরো কিছু নিপুণ যন্ত্র।

একদিন আমাদের টি. পি. সি. দাঁড়া হল। খাঁটি তামার তৈরি অতিকায় একটি চেম্বার, নিচে প্রচণ্ড হাই ভোল্টেজের ডিঙ্ক, ভিতরে নিখুঁত ইলেকট্রিক ফিল্ড, উপরে অসংখ্য ইলেকট্রনিক চ্যানেল। গ্যাস পাঠানোর টিউব, পাম্প, গ্যাস পরিশোধনের যন্ত্রপাতি, সংরক্ষণের নিখুঁত ব্যবস্থা। অসংখ্য ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটারে ইন্টারফেস। প্রয়োজনীয় জিনিসের বেশির ভাগই তাড়াহুড়া করে কাজ চালানোর মতো তৈরি করা, ভিতরের গ্যাসটিও মূল্যবান গ্যাস নয়, সেটা অর্ডার দেয়া হবে যদি যন্ত্রটি ঠিক করে কাজ করানো যায় তখন।

আমি দুরু দুরু বক্ষে প্রথমবার পুরো টি. পি. সি. চালু করেছি আর কী চমৎকার কম্পিউটারের স্ক্রীনে দেখা গেল অদৃশ্য মিউওনের ত্রিমাত্রিক গতি পথ।

রাতে প্রফেসরের বাড়িতে বড় পার্টি। শ্যাম্পেনের বোতল খোলা হল আমাদের উদ্দেশ্যে।একটা কেক তৈরি করে আনা হয়েছে যেটা দেখতে টি. পি. সি.-র মতো!

হঠাৎ করে আমি আর হার্ব একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। ঘোর অবিশ্বাসীরা যারা "তোমাদের টি. পি. সি." বলে কথা বলত তারা হঠাৎ করে "আমাদের টি. পি. সি." বলে কথা বলা শুরু করেছে। জায়গায় জায়গায় দেশে-বিদেশে তার উপর বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে এবং সবচেয়ে যেটা ভয়ঙ্কর, এ ব্যাপারে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। সবচেয়ে ক্ষতিকর সাহায্য হচ্ছে অযাচিত উপদেশ এবং তার যন্ত্রণায় আমার এবং হার্বের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবার অবস্থা।

এতদিনে আমার অভিজ্ঞতা বেড়েছে, নিজের উপর আত্মবিশ্বাস জন্মেছে এবং একটি অমূল্য জিনিস শিখেছি, চোখ-ধাঁধানো আইডিয়ার কোনো মূল্য নেই কিন্তু

কার্যক্ষেত্রে কাজ করে সেরকম ছোট একটি জিনিসের মূল্য অনেক বেশি! আমি তাই বড় বড় আইডিয়া এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতাম। মাঝে মাঝে সেটা নিয়ে কারো কারো সাথে তুলকালাম শুরু হয়ে যেত, কিন্তু আমি বাঙালি হাসির গল্পের সেই নাপিত, কিছুতেই বড় ডাক্তারদের লেকচার শুনতে রাজি হই না!

সেই এক্সপেরিমেন্টটি শেষ পর্যন্ত চমৎকারভাবে দাঁড়া করানো হয়েছিল। সেটিকে বাক্সবন্দী করে পাঠানো হল সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ের নিচে একটি সুড়ঙ্গে। পাহাড়ের শত শত ফুট পাথর তাকে রক্ষা করবে মহাজাগতিক রশ্মি থেকে। সেখানে এক্সপেরিমেন্টটি সবার চোখের অগোচরে একটি রহস্যময় ঘটনা খুঁজে যাচ্ছে, নিজে নিজে সব তথ্য জমা করে রাখছে কম্পিউটারের টেপে। দু' সপ্তাহে একজন গিয়ে সেই টেপ নিয়ে আসে বিশ্লেষণের জন্যে। পৃথিবীর অন্য যারা জিনন গ্যাসে এ ধরনের এক্সপেরিমেন্ট শুরু করেছিল "ডাবল বিটা ডিকে" নামক সেই রহস্যময় ঘটনাটি খোঁজার জন্যে তারা পরাজয় স্বীকার করে থামিয়ে দিয়েছে তাদের এক্সপেরিমেন্ট! আমার আর হার্বের তৈরি সেই টি. পি. সি. এখনো পাহাড়ের বিশাল তথ্যভাণ্ডারের হয়ত অতি ক্ষুদ্র একটি কণা কিন্তু সেটির জন্যে যে সাধনাটি করা হয়েছিল সেটি তো কেউ আমাদের বুকের ভিতর থেকে সরিয়ে নিতে পারবে না!

টি. পি. সি. তৈরি করার মাঝ দিয়ে আমার আর হার্বের মাঝে চমৎকার একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। তার কাছে আমি অনেক কিছু শিখেছি। সে আমাকে প্রথম চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে যে, মানুষের জ্ঞান এবং তার ব্যক্তিগত সততার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। আমি ধরে নিয়েছিলাম, বিজ্ঞান হচ্ছে চুলচেরা বিশ্লেষণ দিয়ে যাচাই করা জ্ঞান, কিন্তু অসংখ্যবার আমি অবাক হয়ে দেখেছি যে, সেটি সত্যি নয়। বিজ্ঞান নিয়ে ব্যবসা করা হয়, অর্থ যশ আর খ্যাতির জন্যে ভুল জিনিসকে সত্যি প্রমাণ করা হয়, সত্যি জিনিসকে গোপন করা হয়। পৃথিবীতে যেরকম অসৎ ব্যবসায়ী রয়েছে, অসৎ আইনজীবী, অসৎ রাজনীতিবিদ রয়েছে ঠিক সেরকম অসংখ্য অসৎ বিজ্ঞানী রয়েছে।

সে রকম একজন অসৎ বিজ্ঞানী হচ্ছে জন মার্কী। আমি তাকে খুব কাছে থেকে দেখেছি, তাই তার সব ছলচাতুরি খুব ভালো করে জানি। জন মার্কী পৃথিবীর একটি সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন ইয়েলের এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর। সে এদিন হার্বের সাথে দেখা করতে এসেছে, প্রাথমিক সম্ভাষণ বিনিময় করে হার্ব বলল, জন ইয়েলের তোমার দুই বছর হয়ে গেল।

হ্যাঁ।

মনে আছে তো আমি তোমাকে কি বলেছিলাম, এক জায়গাতে চার বছরের বেশি নয়।

জন মুখে হাসি টেনে বলল, মনে আছে।

অন্য কেউ হলে বলতাম, তিন বছর, কিন্তু তুমি অনেক বড় ধড়িবাজ, কাজেই তোমার জন্যে চার বছর! প্রথম দু'বৎসর তোমাকে কেউ সন্দেহ করবে না। তৃতীয় বৎসর সন্দেহ করা শুরু করবে। চতুর্থ বৎসরে মান-সম্মান থাকতে থাকতে তুমি যদি সরে না পড় তোমার জেলে যাবার আশঙ্কা।

জন আমার দিকে তাকিয়ে মটকায়, চেয়ারে হেলান দিয়ে দুলে দুলে হাসে, হার্বের কথার কোনো প্রতিবাদ করে না। কেন করবে, সে জানে হার্ব সত্যি কথাই বলছে। বিবেক নামক যন্ত্রণাদায়ক জিনিস থেকে পুরোপুরি মুক্ত এরকম চরিত্রের সাথে সেই আমার প্রথম পরিচয়। সুযোগ পেলে কোনোদিন জনের গল্প করা যাবে, আজ হার্বের কথাই বলা যাক।

যে কোনো সমস্যা হলেই আমি হার্বের কাছে যেতাম। কাজে যোগ দেয়ার কিছুদিনের মাঝেই আমার একটু বিচিত্র ধরনের সমস্যা হল। যে ছাত্রটি আমার সাথে তার পিএইচ. ডি.-র জন্য কাজ করছে, আমি আবিষ্কার করলাম, সে অত্যন্ত কোমল স্বভাবের মায়াবতী মেয়ে, সে অবলীলায় কুড়ি মাইল দৌড়ে যেতে পারে। আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে বলে তার ইংরেজি উচ্চারণ খুব মজার, সে অসম্ভব খাটতে পারে কিন্তু পিএইচ. ডি. করার জন্যে যে গবেষণা করার একটা ক্ষমতা থাকতে হয় সেটি তার একেবারেই নেই। প্রফেসরের সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই, কাজেই তিনি কোনোদিনও জানতে পারবেন না, কিন্তু যেহেতু এক্সপেরিমেন্টটি আমরা দাঁড়া করিয়ে দেব সে একটি পিএইচ. ডি. পেয়ে যাবে, সেটি বিদ্যা এবং জ্ঞানের জগতে নিশ্চয়ই বড় ধরনের অপরাধ। আমি হার্বকে সেটা বলতেই সে হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, বুঝাই যাচ্ছে তুমি এই লাইনে নতুন। অতীতে অনেকবার এখান থেকে গরু ছাগল পিএইচ. ডি. করে গেছে, ভবিষ্যতেও যাবে। তাদের মূল্য বিচার করা তোমার দায়িত্ব নয়, সেজন্যে অনেক বড় বড় কমিটি আছে। তোমার দায়িত্ব এই এক্সপেরিমেন্টটি দাঁড়া করানো, তার জন্যে যে যেরকম কাজ করতে পারে তাকে সেরকম কাজ ভাগ করে দেবে। তাও যদি না পার তাহলে তাকে ফালতু কোনো কাজ দিয়ে ব্যস্ত রাখবে যেন তোমাকে যন্ত্রণা না করে!

হার্বের কথা সত্যি হয়েছিল। মায়াবতী এই ছাত্রীটি যন্ত্রপাতির স্ক্রু লাগানো এবং খোলার কাজ নিষ্ঠার সাথে করে পৃথিবীর অন্যতম বিদ্যাপীঠ থেকে একটি পিএইচ. ডি. নিয়ে বের হয়ে গেছে! আমি নিজের চোখে না দেখলে এটি কিছুতেই বিশ্বাস করতাম না।

হার্ব হচ্ছে একজন জন্ম দার্শনিক। তার সাথে যে অল্প সময়ের জন্যে কথা বলেছে সাথে সাথে টের পেয়েছে। দুঃসহ দারিদ্র্যে তার শৈশব কেটেছে, যৌবন কেটেছে বামপন্থী রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন করে, পরিণত বয়সে মন দিয়েছে বিজ্ঞান গবেষণায়। এই মানুষটি যদি দার্শনিক না হয় কে হবে দার্শনিক ? জগৎ সংসারের সবকিছুকে হার্ব একটু অন্যরকমভাবে দেখত।

একবার এখানকার স্টক মার্কেট "ক্র্যাশ" করে অনেক মানুষের অনেক টাকা লোকসান হয়ে গেল। আমি হার্বকে জিজ্ঞেস করলাম, হার্ব, তোমারও কি টাকা লোকসান হয়েছে ?

কিছু তো হয়েছেই।

কত ?

এইচ চল্লিশ হাজারের মতো!

চ-চ-চল্লিশ হাজার ডলার ?

হার্ব মাথা নেড়ে বলল, স্টক মার্কেটের ব্যাপার বোঝই তো– একদিক দিয়ে আসে আরেকদিক দিয়ে যায়।

আমি অবশ্যি স্টক মার্কেট বুঝি না (পরিশ্রম না করে শুধু টাকা খাটিয়ে টাকা উপার্জন করার মাঝে কেমন যেন অসাধুতার গন্ধ পাই), কিন্তু তবুও চল্লিশ হাজার তো খেলা কথা নয়। হার্বকে আমি এতটুকু বিচলিত হতে দেখলাম না। অস্ট্রেলিয়ার এক সহকর্মী আছে, স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করার পর সে প্রায় ক্ষ্যাপার মতো হয়ে গেছে, তবে তার সমস্যা রয়েছে। তার মতো কৃপণ মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। বাবার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে অস্ট্রেলিয়াতে তাকে রাত দুটোর সময় ঘুম থেকে ডেকে তুলল, কারণ তখন টেলিফোন করলে একটু সস্তা রেট পাওয়া যায়।

প্রায় ব্যাপারেই হার্বের নানারকম থিওরী আছে। ভাগ্য সম্পর্কে তার থিওরীটি চমৎকার। কি এক কথা প্রসঙ্গে ভ্যাল তেলেগদী নামে একজন রুঢ় ভাষী কিন্তু খুব বড় বিজ্ঞানী হার্বকে বলল, তোমার খুব কপাল ভালো যে ডিজাইনের মাঝে এরকম বড় বড় ঝুঁকি নাও কিন্তু সেগুলি কাজ করে।

হার্ব বলল, সেটা কয়বার হয়েছে ভ্যাল?

ভ্যাল হাতে গুনে বলল, বেশ অনেকবার।

ভাগ্য একবার কাজ করে, বড় জোর দুইবার। যেটা অনেকবার কাজ করে সেটা ভাগ্য না।

সেটা কি?

চিন্তা করে দেখ, তুমি নিজেই বুঝবে।

ভ্যাল তেলেগদী খানিকক্ষণ চিন্তা করে মুচকি হেসে বলল, তুমি দাবি কর তুমি বড় ইঞ্জিনিয়ার, তাই তো?

হার্ব কোনো কথা না বলে উদাসভাবে বাইরে তাকায়।

ভাগ্য সম্পর্কে তার থিওরীটি হার্ব পরে আমাকে বলেছে। তার মতে, যারা সাবধানী মানুষ ভাবনা-চিন্তা করে কাজ করে এবং সুচিন্তিত ঝুঁকি নেয়, দেখা গেছে তারা সৌভাগ্যবান। যে কোনো বড় কাজ করার জন্যে খানিকটা ঝুঁকি নিতে হয় সেটা কত চিন্তা করে নেয়া হয় তার উপরে? সাফল্যের একটা বড় অংশ নির্ভর করে। আবার যারা বেখেয়ালী, অবিবেচক কিংবা বোকা, দেখা গেছে, তাদের ভাগ্য খারাপ। এ ব্যাপারে হার্বের সবচেয়ে প্রিয় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের কমবয়সী সেক্রেটারী মেয়েটি, এলসা। সবসময়েই এলসার কোনো না কোনো ঝামেলা লেগে আছে। পার্কিং লট থেকে তার নতুন গাড়ি চুরি হয়ে যায়, গাড়ি ভেঙে তার ভিতরের জিনিস চুরি হয়ে যায়, অফিস থেকে তার ব্যাগ চুরি হয়ে যায় এবং হার্বের ধারণা, এই সব ঘটেছে কারণ এলসার মতো বেখেয়ালী একটি মেয়ে খুব বেশি নেই। শুধু তাই নয়, এলসার স্বামী যে অন্য একটি মেয়ের সাথে পালিয়ে গেছে, হার্বের ধারণা, সেই দুর্ভাগ্যটিও সে নিজে ডেকে এনেছে।

হার্ব খুব সুন্দর কথা বলতে পারে। তার মতো এত চমৎকার উপমা দিয়ে কথা বলতে আমি কাউকে দেখিনি। একবার আমার বাড়িওয়ালী বুড়ীকে আমি এয়ারপোর্ট থেকে তুলে এনেছিলাম, তার স্বামী মারা যাবার পর তাকে তুলে আনার

কেউ ছিল না তাই। বুড়ীকে তার বাসায় নামিয়ে দেবার পর সে আমার হাতে দুটি দশ ডলারের নোট ধরিয়ে দিল। আমি টাকাগুলি তার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললাম, আমি তো তোমাকে টাকার জন্যে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে আনিনি।

বুড়ী হকচকিয়ে গিয়ে বলল, কেন এনেছ তাহলে?

তুমি যেরকম আমাকে নানা সময় সাহায্য করেছ আমিও সেরকম করছি। একজন মানুষ যেরকম আরেকজন মানুষের জন্যে করে–

শুনে হঠাৎ বুড়ীর চোখে পানি এসে গেল, আমার হাত ধরে কেঁদে ফেলল একেবারে। এদেশে বুড়ো-বুড়ীদের খুব খারাপ অবস্থা, আন্তরিকতা দূরে থাকুক, ভদ্রতার কথা পর্যন্ত কেউ বলে না।

আমি হার্বকে গল্পটা বললাম, শুনে সে বলল, পৃথিবীতে দু'রকম জিনিস আছে, একটা হচ্ছে ডাকটিকেট, আরেকটা হচ্ছে কেক। কেউ যদি তোমাকে কেক খাওয়ায় তাহলে কখনো তার দাম ধরিয়ে দিতে হয় না, তাহলে বন্ধুত্বের অপমান করা হয়। কিন্তু কখনো যদি কাউকে বলা হয় একটা ডাকটিকেট কিনে আনতে, যত কমই হোক, তাকে সেই পয়সাটা দিতে হয়। সবাইকে জানতে হবে কোন্‌টা কেক এবং কোন্‌টা ডাকটিকেট।

আমি হার্বের এই উপমাটা সব সময় মনে রেখেছি, দৈনন্দিন জীবন অনেক সহজ হয়ে গেছে তারপর। শুধু তাই না, অনেক সময় আমি আগেভাগে বলে দিয়েছি, এটা কিন্তু ডাকটিকেট না এটা হচ্ছে কেক, কারণ এদেশে কেক খুব বেশি নেই, বেশিরভাগই হচ্ছে ডাকটিকেট!

হার্ব খুব আমুদে মানুষ। তার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব। তার একজন বন্ধু হচ্ছে রুডলফ মসবাওয়ার, ১৯৬১ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। মসবাওয়ার যে যন্ত্রটি দিয়ে পরীক্ষা করে নোবেল প্রাইজটি পেয়েছিলেন হার্ব সেটা তাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন। হার্বের আরেকজন বন্ধুর নাম জন মেলন। এই এলাকার ডাক পিয়ন। দুজনের সাথেই তার একই রকম ঘনিষ্ঠতা।

এই আড্ডাবাজ, বুদ্ধিমান এবং আমুদে মানুষটির জীবনে একটি মাত্র ক্ষুদ্র সমস্যা। সেটি হচ্ছে তার স্ত্রী। হার্ব যেরকম মিশুক তার স্ত্রী ঠিক সেরকম অমিশুক। হার্ব যেরকম বাইরে হৈচৈ করতে পছন্দ করে তার স্ত্রী ঠিক সেরকম ঘরকুনো। কারো সাথে মেশা দূরে থাকুক, গত কুড়ি বৎসরে তার স্ত্রী কোনো মানুষের সাথে দেখা করেনি! হার্ব কখনো তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবদের কাউকে নিজের বাসায় চা পর্যন্ত খেতে নিয়ে যেতে পারেনি, তাদের সে সবসময় আপ্যায়ন করতে নিয়ে যেত ভালো রেস্টুরেন্টে। হার্বের স্ত্রী একসময় খুব ভালো ছবি আঁকত, আজকাল ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুধু বই পড়ে। বছরে সে হাজার, খানেক বই পড়ে, সেটি কীভাবে সম্ভব আমি জানি না, শুনেছি দ্রুত পড়ার কি একটা কায়দা আছে, সেটা একবার শিখে নিলে নাকি চোখ বুলিয়েই মানুষ পড়তে পারে, আলাদা আলাদা করে প্রতিটি শব্দ পড়তে হয় না। বই পড়া যে তার স্ত্রীর কাছে কত গুরুত্বপূর্ণ সেটা বুঝা গেছে যখন একবার তার হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচারের জন্যে নিয়ে গেছে তখন অচেতন করার আগে সে হার্বকে বলল, যদি আমি মরে যাই?

হার্ব বলল, না, তুমি মারা যাবে না।

হ্যাঁ, আমি এখন মারা গেলে চলবে কেমন করে?

"সাটানিক ভার্সেস" বইটা শেষ করা হয়নি এখনো।

সালমান রুশদির "সাটানিক ভার্সেস" বইটা সবে বের হয়েছে, খুব হৈচৈ হচ্ছে সেটা নিয়ে তখনো।

বলা বাহুল্য, হার্বের স্ত্রী মারা যায়নি, ভালো হয়ে বাসায় ফিরে এসেছে। হার্ব তাকে দেখাশুনা করে রেখেছে। এই বিচিত্র স্বভাবের মহিলাটির জন্যে হার্বের বুকে ছিল অফুরন্ত ভালবাসা। ছোট শিশুকে মানুষ যেমন করে আগলে রাখে সে ঠিক সেরকম করে তাকে আগলে রাখত। প্রতিদিন রান্না করত, খাওয়ার পর থালাবাসন ধুয়ে রাখত। ঘর পরিষ্কার করত, বাইরে ঘাস কাটত কুকুরকে নিয়ে হাঁটতে বের হত। মাসে একদিন তার চুল কেটে দিত। আমেরিকান একজন পুরুষ মানুষকে কখনো তার স্ত্রীর জন্যে এত বড় ত্যাগ স্বীকার করতে দেখেনি।

একদিন আমাদের সেক্রেটারী এলসার সাথে কি নিয়ে হার্বের একটু কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। হার্ব কি একটা বলেছে আর সাথে সাথে এলসার হাউ হাউ করে কি কান্না! অনেক কষ্ট করে হার্ব তাকে শান্ত করল।

পরদিন হার্ব আমাকে বলল, কী লজ্জার ব্যাপার বল। আমি গত কাল এলসাকে কাঁদিয়ে দিলাম।

আমি বললাম, এলসা তোমাকে আপনজন মনে করে, তাই অল্পতে দুঃখ পেয়ে গেছে।

বাসায় গিয়ে স্ত্রীকে কথাটা বললাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, তোমাকে কি আমি কখনো রুঢ় কথা বলে চোখে পানি আনিয়েছি? আমার স্ত্রী কি বলল জান?

কি?

বলল, না, আমাদের প্রায় চল্লিশ বছরের বিবাহিত জীবনে তুমি কখনোই আমাকে দুঃখ দাওনি। সুখের আবেগে কখনো কখনো চোখে পানি এসেছে, কিন্তু দুঃখ? কখনো না–

আমি বললাম, হার্ব, তোমার পা'টা এগিয়ে দাও।

কেন?

একটু পদধূলি নেই।

সেটা আবার কি?

পদধূলি কি এবং সেটা কেন, কখন এবং কীভাবে নিতে হয় হার্বকে বুঝিয়ে দিতে হল। শুনে হার্ব হা হা করে হাসা শুরু করে!

বছর চারেক আগে আমি ক্যালটেক ছেড়ে চলে এসেছি। হার্বের সাথে এখনো যোগাযোগ আছে। যখনই লসএঞ্জেলস এলাকায় গেছি তার সাথে দেখা করেছি (সে আমার চুল কেটে দিয়েছে), সে যখন নিউ ইয়ার্ক এলাকায় এসেছে আমার সাথে দেখা করেছে। কিছুদিন আগে হঠাৎ করে সে আমাকে খুব ব্যস্ত হয়ে টেলিফোন করল। বলল, জাফর, মহা সমস্যা।

কি হল?

তুমি যখন এখানে ছিলে একটা "আমেরিশিয়াম" সোর্স কেনা হয়েছিল, মনে আছে?

আমেরিশিয়ামের একটি বিশেষ আইসোটোপ তেজস্ক্রীয় মৌল, সেটা ব্যবহার করে আলফা সোর্স তৈরি করা হয়। আমাদের পরীক্ষায় ব্যবহারের জন্যে সেটা কেনা হয়েছিল। আমি হার্বকে বললাম, হ্যাঁ, মনে আছে।

সেটা কোথায় আছে তুমি জান?

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। এতদিন পরে আমি কেমন করে জানব! বললাম, জানি না হার্ব। সবগুলি তেজস্ক্রীয় সোর্স এক জায়গায় রাখা হয়, সীসা দিয়ে তৈরি ছোট বাক্সটাতে, মনে আছে? দেখেছ সেখানে?

হার্ব চিন্তিত স্বরে বলল, দেখেছি, নেই। সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি, কোথাও পাইনি।

দরকারটা কি?

তেজস্ক্রিয় মৌল নিয়ে সরকারি আইন খুব কড়া, জান তো। সব তেজস্ক্রিয় জিনিসের হিসেব থাকতে হয়। সরকার থেকে লোকজন এসেছে, তারা প্রত্যেকটা তেজস্ক্রিয় সোর্স দেখে, পরীক্ষা করে কাগজপত্রের সাথে মিলিয়ে দেখে তারপর ফিরে যাবে। সবগুলি সোর্স পাওয়া গেছে কিন্তু আমেরিশায়ম সোসটা পাওয়া যাচ্ছে না। মহা যন্ত্রণা!

না পেলে কি হবে?

বড় ঝামেলা হতে পারে। গত বছর এরকম একটা ব্যাপার নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়াতে দুজনের চাকরি চলে গেল।

হার্বকে খুব চিন্তিত দেখা গেল। আমার স্মৃতি দুর্বল তবুও চেষ্টা করে যা যা মনে আছে তাকে জানালাম। সোর্সটা কবে কেনা হয়েছিল, দেখতে কি রকম, কদিন আমি ব্যবহার করেছি, কোথায় ব্যবহার করেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দুদিন পর হঠাৎ শুনি হার্ব আমার টেলিফোনে আমার জন্যে একটা খবর রেখে গেছে। খবরটা এরকম "জাফর। তুমি কি তেজস্ক্রিয় আমেরিশিয়াম সোর্সের রহস্যজনক অন্তর্ধানের গল্প শুনতে চাও? হা হা হা, শুনতে চাও তাহলে অবিলম্বে আমাকে ফোন কর। হা হা হা ..."

তেজস্ক্রিয় একটা সোর্স হারিয়ে গেছে, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সরকারি কর্মকর্তারা সেটার জন্যে চোখ লাল করে লাঠি হাতে হার্বের পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এর মাঝে এত মজা কি হতে পারে? বড়জোর সেটাকে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু তার বেশি তো কিছু নয়। আমি কৌতূহলী হয়ে তক্ষুনি হার্বকে ফোন করলাম। হার্ব ফোন করে হাসতে হাসতে ভেঙে পড়ল, বলল, তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না, কি হয়েছে।

কি হয়েছে?

তোমার সাথে পরশুদিন যখন কথা হল তখন তুমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছ। এক ঃ জিনিসটা কবে কিনেছ, দুই ঃ জিনিসটা দেখতে কি রকম। আমি তখন

পুরনো কাগজপত্র ঘেঁটে সোর্সটার পার্চের অর্ডার বের করলাম। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে সেটা কেনা হয়েছিল। কত দাম পড়েছিল জান?

কত?

বিশ্বাস করবে না, মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার।

পঁয়ত্রিশ ডলার?

হ্যাঁ, মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার! একটা তেজস্ক্রিয় সোর্স অথচ তার দাম মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার" বিশ্বাস করতে পার?

আমি অবাক হলাম কিন্তু হারিয়ে যাওয়া তেজস্ক্রিয় সোর্সের সাথে তার স্বল্পমূল্যের কি সম্পর্ক থাকতে পারে বুঝতে পারলাম না।

হার্ব বলল, যখন দেখলাম দাম মাত্র পঁয়ত্রিশ ডলার তখন হঠাৎ করে সব রহস্য উদঘাটন হয়ে গেল!

কেমন করে?

তেজস্ক্রিয় সোর্সের কোম্পানি জিনিসটা বিক্রি করছে পঁয়ত্রিশ ডলারে, তার মানে আসলে জিনিসটার দাম আরো অনেক কম! ওরা লাভ রেখে বিক্রি করেছে পঁয়ত্রিশ ডলারে, তার মানে আসলে এটার দাম দুই তিন ডলারের বেশি নয়। একটা জিনিসের দাম এত কম কেমন করে হতে পারে?

আমি মাথা চুলকে বললাম, কখন?

যখন একটা জিনিস এক সাথে লক্ষ লক্ষটা তৈরি করা হয় তখন।

কিন্তু লক্ষ লক্ষ আমেরিশিয়াম সোর্স তৈরি হবে কেন? এটা কি টেবিল ল্যাম্প? না কি টুথপেস্ট?

হা হা হা– হার্বের হাসি আর থামে না! বলল, তখনই তো রহস্য উদঘাটন হয়ে গেল। হঠাৎ করে মনে পড়ল স্মোক ডিটেক্টর তৈরি করার জন্যে তার ভিতরে একটা তেজস্ক্রীয় সোর্স দিতে হয়। আমেরিকার সব বাসায় একটা করে স্মোক ডিটেক্টর আছে– কুড়ি ডলারে একটা স্মোক ডিটেক্টর পাওয়া যায়।

তার মানে স্মোক ডিটেক্টরে আমেরিশিয়াম সোর্স ব্যবহার করা হয়?

হ্যাঁ। আমি তক্ষুনি দোকান থেকে একটা স্মোক ডিটেক্টর কিনে এনে খুলে ফেলেছি! ভিতরে একটা আমেরিশিয়াম সোর্স! ঠিক তুমি যেরকম বলেছ এক ইঞ্চি স্টেনলেস স্টীলের ডিস্ক, মাঝখানে দুই মিলিমিটার সোনার পাতলা আস্তরণ দিয়ে ঢাকা! তুমি যেটা কিনেছিলে তার সাথে কোনো পার্থক্য নেই!

এবারে আমার হাসার পালা। হার্ব বলল, একটু আগে সরকার থেকে বড় বড় লোকজন এসেছিল তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে। আমি তাদের স্মোক ডিটেক্টর থেকে বের করা আমেরিশিয়াম সোর্সটি দিয়েছি। তারা খুব গম্ভীর হয়ে মেপেঝুকে দেখে মাথা নেড়ে কাগজপত্রের সাথে মিলিয়ে খুশি হয়ে ফিরে গেছে হা হা হা–

আমি বললাম, তার মানে যে সোর্সটা পাওয়া না গেলে কারো চাকরি চলে যায়, মিলিওন ডলার ফাইন হয়ে যায়, সেটা উনিশ ডলারের স্মোক ডিটেক্টরের মাঝে রয়েছে? যার খুশি যখন খুশি যতগুলি ইচ্ছে কিনে নিয়ে আসতে পারবে?

হ্যাঁ। এর থেকে বড় ফাজলেমীর কথা শুনেছ কখনো?

আমাকে স্বীকার করতেই হল যে আমি শুনিনি।

কি বল, ব্যাপারটা ফাঁস করে দেব?

আমি বললাম, দাও।

আরো কয়টা দিন যাক, তারপর দেখা যাবে।

হার্বের সাথে আমার এখনো যোগাযোগ আছে। ভালো আছে কি না জানি না। তার স্ত্রী, যার সাথে চল্লিশ বছরে একবারও রূঢ় কথা বলেনি– সেই স্ত্রীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। ফোনে আমি যখন কথা বললাম, জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছ?

ভালো। বলতে পার মুক্ত স্বাধীন একজন মানুষ।

সত্যি?

সে বলল, সত্যি।

কে জানে! আমি মনে হয় হার্বকে কখনো বুঝতে পারিনি। কে জানে হয়ত আমি কোন মানুষকেই বুঝতে পারিনি। হয়ত মানুষকে কখনো বুঝা যায় না।

১৯৯২

প্রবাসী বাঙালি

আমার এক বাঙালি বন্ধুর বাসায় মদ খাওয়ার আসর বসেছে। নিয়মিতভাবে এরকম আসর বসে সেটি সত্যি নয়, আজ কে জানি পেটমোটা একটা বোতল নিয়ে এসেছে- সেটি নাকি অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর হুইস্কি, সে কারণে এই আসর। ছোট ছোট প্লাস্টিকের গ্লাসে ঢেলে সবাইকে দেয়া হচ্ছে, আমাকেও দেয়া হল। আমি বললাম, আমার লাগবে না।

যিনি দিবেন তিনি একটু অবাক হলেন, বিনি পয়সায় ভালো মদ পেয়েও খায় না সেরকম মানুষ মনে হয় তিনি আগে বেশি দেখেননি। জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি খাবে না?

না।

কেন?

আমি মদ খাই না।

মদ? তিনি চমকে উঠলেন, কেউ এরকম সম্ভ্রান্ত পানীয়কে মদ বলতে পারে বিশ্বাস করতে পারলেন না। মদ বললেই হয়ত তাঁর চোখে নিম্নশ্রেণীর মানুষের নেশা-ভাংয়ের একটা ছবি ভেসে উঠে। তিনি একটু রেগে উঠে বললেন, খাও না?

না।

এর পর তিনি যেটা করলেন সেটা আরো বিচিত্র। সবাইকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, এই যে দেখ একজন, ড্রিংক করে না। হা হা হা হা, যাকে বলে শান্তশিষ্ট লেজবিশিষ্ট, লেজের আগায় গোছাবিশিষ্ট- হা হা হা হা-

অত্যন্ত উঁচুদরের রসিকতা দাবি করব না কিন্তু যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সবাই হাসিতে গড়িয়ে পড়লেন।

এটা বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়, এরকম ব্যাপার আগেও ঘটেছে, একবার নয়, অসংখ্যবার। যে সব বাঙালি এদেশে এসে মদ্যপান শিখেছেন তাঁরা অন্যদের মদ খাওয়ানোর জন্যে জীবনপণ করে ফেলেন। তাঁরা আরো অনেক কিছু শিখেছেন, পাহাড়ে ট্রেক করতে শিখেছেন, শনিবার রাতে বোলিং করা শিখেছেন, হ্রদে মাছ ধরা শিখেছেন, সেগুলি অন্যদের শেখাতে কখনো চেষ্টা করেন না, কিন্তু মদ খাওয়ার ব্যাপারটিতে তাঁরা নিজেরা খেয়ে যত আনন্দ পান অন্যদের জোর করে ধরেবেঁধে খাইয়ে মনে হয় আরো অনেক বেশি আনন্দ পান। অন্যেরা তাঁদের কথা শুনে খেলে ভালো, না খেলে তাদের নানারকম নির্যাতন করতেও আপত্তি নেই!

দেখে-শুনে মন হয় পৃথিবীর এই প্রাচীনতম পানীয়টি সত্যিকার অর্থে তাঁর কখনো উপভোগ করেননি, বরং সেটা নিয়ে তাঁদের ভিতরে খানিকটা অপরাধবোধ রয়েছে। সেটা হয়ত খুব অস্বাভাবিক নয়। আমাদের সংস্কৃতিতে মদ জিনিসটি খুব

উচ্চাসনে নেই। সৈয়দ মুজতবা আলী ছাড়া আর কেউ এই পানীয় সম্পর্কে দয়ার্দ্র কথা বলেছেন বলে মনে পড়ে না। পরিচিত অনেক কবি-সাহিত্যিকের এর জন্যে দুর্বলতা রয়েছে আবিষ্কার করেছি কিন্তু প্রকাশ্যে কাউকে সেটা স্বীকার করতে দেখিনি। পশ্চিম বাংলার লেখালেখিতে এটাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ করা হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দেশে হয়েছে বলে মনে হয় না। সম্ভবত আমরা যে পরিবেশে বড় হয়েছি সেটা একটা বড় কারণ।

আমার বয়স যখন সাত বৎসর আমার ক্লাসের এক বন্ধু খোঁজ আনল, স্থানীয় অফিসের জনৈক সেকেন্ড অফিসার নাকি মদ খান! খবরটি শুনে আমাদের সবার মাঝে উত্তেজনার একটা শিহরণ বয়ে গেল। স্কুল ছুটির পর আমরা একদিন দল বেঁধে সেই মানুষটিকে দেখতে গেলাম, যে মানুষ মদ খায় তাকে দেখা চিড়িয়াখানার কোনো বিচিত্র প্রাণী দেখার চাইতে কোনো অংশে কম উত্তেজনার নয়। দীর্ঘ কয়েক মাইল হেঁটে আমরা একটা অফিসের বাইরে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে সেই মানুষটিকে দেখলাম। গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ- চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা- টেবিলে ঝুঁকে গভীর মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন। এ মানুষটি মদ খায় চিন্তা করে আমাদের সবার শরীরে আবার শিহরণ বয়ে গেল। দীর্ঘ পথ হেঁটে আমরা আবার বাসায় ফিরে এসেছিলাম।

আমার পরিচিত বাঙালি বন্ধু-বান্ধব সবাই নিশ্চয়ই আমার মতো পরিবেশেই বড় হয়েছেন, সবার ভিতরে মোটামুটি একই রকম সংস্কার। সেই সংস্কার ভাঙতে গিয়ে মনে হয় কোথায় জানি একটা টান অনুভব করেন, কে জানে হয়ত দেশে ফেলে আসা বৃদ্ধা মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। সেটা থেকে বের হয়ে আসার জন্যে সঙ্গী প্রয়োজন, এমনি হলে ভালো, এমনি যদি না হয় জোরাজুরিতে অসুবিধে নেই।

শৈশবে আমরা বান্দরবন নামে এক রহস্যময় জায়গায় বেশ কিছুদিন ছিলাম। আমার বাবাকে পুলিশের কাজে মাঝে মাঝেই দীর্ঘ দিনের জন্যে পাহাড়ের অভ্যন্তরে চলে যেতে হত। আমার বাবা বান্দরবনের সেই পাহাড়ি এলাকা নিয়ে খুব চমৎকার কিছু লেখা লিখেছিলেন, একাত্তরে সারা দেশটাকে যখন তছনছ করা হয়েছে আমার বাবার সাথে সেই লেখাগুলিও হারিয়ে গেছে। আমার বাবার সেই লেখাগুলি পড়ে আমার খুব শখ ছিল সেখানে কোনো একদিন বেড়াতে যাব। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় একবার হঠাৎ করে পরীক্ষা পিছিয়ে যাবার পর দুজন বন্ধুকে নিয়ে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম- উদ্দেশ্য একটা নৌকা ভাড়া করে শঙ্খ নদী বয়ে গহীন পাহাড়ে উঠে যাওয়া, ঠিক বাবা যেভাবে গিয়েছিলেন। চমৎকার কয়েকটি দিন কেটেছিল আমাদের, নৌকাতে খাওয়া, নৌকাতে ঘুম, নদীর স্বচ্ছ পানিতে পা ডুবিয়ে বসে থাকা, নদীতীরে, পাহাড়ে হেঁটে বেড়ানো, হরিণের ডাক শুনতে শুনতে ঘুমানো, পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে ওঠা- সেই অপূর্ব বিস্ময়কর সৌন্দর্যের কথা আমি কখনো ভুলব না।

মনে আছে, এক জ্যোৎস্না রাতে দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে নৌকা করে যাচ্ছি, হঠাৎ দেখি পাহাড় বেয়ে উপজাতীয় নারী-পুরুষ তরুণ-তরুণী দল বেঁধে গান গাইতে গাইতে নেমে আসছে। তাদের হাতে মশাল, মশালের আলোতে তাদের

উজ্জ্বল যৌবন যেন প্রাণ-প্রাচুর্যে ফেটে পড়ছে, মনে হয় আনন্দের ঢল নেমেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম, তাদের কি একটা উৎসব- নৌকা থামিয়ে তখনি আমরা সেই আদিবাসী তরুণ-তরুণীদের সাথে যোগ দিলাম! তারা আমাদের নিয়ে গান গাইতে গাইতে নাচতে নাচতে সেই উৎসবে নিয়ে গিয়েছিল। অপূর্ব একটি উৎসব, পাহাড়ি মেয়েদের নাচ, জুয়াখেলা, মদের আসর- কি নেই সেখানে! আমরা তিনজন একমাত্র তথাকথিত সভ্য জগতের বাসিন্দা, আমাদের আপ্যায়ন করার জন্যে তারা খানিকটা মদ নিয়ে এল, ঘন লাল রঙের বিদ্‌ঘুটে একটা তরল পদার্থ- দেখলেই নাড়ি উল্টে আসতে চায়।

আমার হঠাৎ করে বাবার একটা লেখার কথা মনে পড়ে গেল। বাবা লিখেছিলেন, সভ্য মানুষ এলে তারা সবসময় মদের পাত্র নিয়ে আসে। অতিথিদের মদ দিয়ে আপ্যায়ন করতে হয়- সেটা আদিবাসীদের রীতি। কিন্তু তারা জানে, সভ্য মানুষদের সেটা খাওয়ার কথা নয়, কেউ যদি খেয়ে ফেলে, তারা ধরে নেয়, লোকটার মাঝে কিছু একটা সমস্যা রয়েছে- তাকে তারা আর বিশ্বাস করে না। আবার যদি কেউ ঘেন্নায় ছিঃ ছিঃ করে উঠে, তারা আহত হয়। আমার বাবা লিখেছিলেন, সবচেয়ে ভালো হয় মদের পাত্রটি স্পর্শ করে বলা, তোমরা খাও, আমরা তো এটা খাই না।

আমি তাই করলাম, মদের পাত্রটি স্পর্শ করে বললাম, আমরা তো এটি খাই না, তোমরা খাও।

যে এনেছিল সে খুব খুশি হয়ে ঢক ঢক করে মদটা গিলে ফেলল। মদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর লোকগুলি আমাদের খুব সহজভাবে নিয়ে নিল। মশাল জ্বলছে, তার মাঝে আনন্দ উৎসব। সারা রাতই থাকার ইচ্ছে ছিল কিন্তু শেষ রাতের দিকে দেখি প্রচণ্ড শীতে একেবারে জমে যাচ্ছি। আমরা ঠিক করলাম নৌকায় ফিরে যাব। আমাদের এক রাতের বন্ধুরা বড় বড় কয়েকটা মশাল তৈরি করে আমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে কেমন করে ফিরে যেতে হবে বলে দিল- ক্ষীণ একটা স্রোতধারা পাহাড় বেয়ে নিচে নেমে গেছে, সেটা ধরে হেঁটে গেলেই হবে! নির্জন পাহাড়ি পথ ধরে আমরা নৌকায় ফিরে এসেছিলাম।

বাঙালিদের মদ খাওয়ার আসরে তারা যখন মদ খাওয়ার জন্যে ঝোলাঝুলি করতে থাকে তখন সবসময় আমার নিশিরাতে এক আদিম উৎসবের কথা মনে পড়ে যায়। সেই উপজাতীয় মানুষও আমাদের জন্যে মদের পাত্র নিয়ে এসেছিল, না করার পর তারা একবারও জোর করেনি। মদ খাওয়া নামক ব্যাপারটি তাদের কাছে লোক-দেখানো কৃত্রিম সংস্কার-বহির্ভূত উচ্চমানের কোন জিনিস ছিল না, সেটা ছিল তাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ। তার জন্যে বাড়াবাড়ি করার কোনো প্রয়োজন নেই- তারা কখনো করে না।

প্রবাসী বাঙালিরা খুব সমিতি করতে পছন্দ করে। ব্যাপারটা মনে হয় আমাদের রক্তের মাঝেই রয়ে গেছে। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে একটা সমিতি তৈরি করেছিলাম, দেশ ও দশের উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও ধর্মের উপর গবেষণা ছিল সেই সমিতির মহৎ উদ্দেশ্য। ছোট্ট ছিলাম বলে উদ্দেশ্যের কোনোটাই

বাস্তবায়িত করতে পারিনি কিন্তু বড় হয়ে কী করব তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় চমৎকার সময় কেটে যেত।

প্রথম যখন দেশের বাইরে এসেছি, আমেরিকার সিয়াটল শহরে, বাংলাদেশের বাঙালি বলতে আমি একা। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেশের কথা ভেবে লম্বা লম্বা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, বন্ধু-বান্ধবদের লম্বা লম্বা চিঠি লিখি। খামের উপরে নিজের নাম লিখে ঠাট্টা করে নিচে বড় বড় করে লিখতাম- বাংলাদেশ সমিতির প্রেসিডেন্ট! একজন মানুষের সেই সমিতির কার্যক্রমে কোনো সমস্যা ছিল না- থাকার কথাও নয়।

বছর তিনেক পর আবিষ্কার করলাম। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় গোটা ছয়েক বাংলাদেশের বাঙালি হয়ে গেছে। তখন হঠাৎ করে আমরা সাবই একটা সমিতি দাঁড় করানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে সব দেশের সমিতি আছে, তারা নববর্ষ, স্বাধীনতা দিবস পালন করে, আমরা কেন পিছনে পড়ে থাকব ? বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী সমিতি দাঁড় করানোর আগে একটা সংবিধান লিখতে হয়। আমাদের একজন অনেক খেটেখুটে সেই সংবিধান তৈরি করল। প্রথম লাইনটি ছিল এরকম ঃ "বাংলাদেশের যে কোনো ছাত্র কিংবা ছাত্রী এই সমিতির সদস্য কিংবা সদস্যা হতে পারবে-"

দুদিন পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাদের চিঠি লিখে জানাল এই সংবিধান নিয়ে আমাদের তারা সমিতি করতে দেবে না। সংবিধানের প্রথম লাইনটি কেটে লাল কালি দিয়ে বড় বড় করে লিখেছে, এই সমিতি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে হতে পারবে না, এটাকে সবার জন্যে উন্মুক্ত রাখতে হবে।

আমি একটা ধাক্কা খেলাম কিন্তু ধাক্কা খেয়ে আমার চোখ খুলে গেল। হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম, সারা পৃথিবীর মানুষ মিলে একটা সমাজ। তাদের মাঝে নানারকম দেশ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি রয়েছে এবং এই বৈচিত্র্যটাই হচ্ছে মানব সমাজের সৌন্দর্য। একে অন্যের বৈচিত্র্যকে উপভোগ করবে, উপভোগ করতে দেবে, যক্ষের মতো আগলে রাখবে না। কার্যক্ষেত্রে কী হবে জানি না কিন্তু উদ্দেশ্যটা কি চমৎকার।

আমাদের ভিতরে যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করতে সক্ষম তাঁরা অবশ্যি আমার সাথে একমত হলেন না। পুরো ব্যাপাটির মাঝে তাঁরা একটা গভীর ষড়যন্ত্রের চিহ্ন খুঁজে পেলেন। বিদেশী অনুচরেরা কীভাবে এই সমিতিতে অনুপ্রবেশ করে সংখ্যাধিক্যের জোরে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ফেলবে সেটা চিন্তা করে তাঁরা শিউরে উঠতে লাগলেন। সংবিধানকে ফাঁকি দিয়ে কীভাবে বাংলাদেশ সমিতির মাঝে বাংলাদেশের বাঙালি ছাড়া অন্য কাউকে ঢুকতে দেয় না যায় সেটা নিয়ে চিন্তা করতে করতে তাঁরা প্রায় তাঁদের মাথার চুল পাকিয়ে ফেললেন। গোপনে মিটিং করার সময় সেটা সবাইকে না জানিয়ে খবরের কাগজের এক কোণায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সেটা আহ্বান করা হতে থাকল। বলাবাহুল্য, সেই সমিতি খুব বেশিদূর এগুতে পারেনি। সন্দেহ, ভীতি এবং আতংক নিয়ে কোনো সমিতি দাঁড়া করালে তার বেশিদূর যাবারও কথা নয়।

পরবর্তী সময়ে আমি বাঙালিদের বড় সমিতি দেখেছি। সেখানকার সদস্য-সদস্যা হাতেগোনা কয়েকজন নয়, প্রায় হাজারের কাছাকাছি। বড় সমিতি বলে তারা বড় কাজ করতে পারে, শহীদ দিবস, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবসে তারা চোখ-ধাঁধানো অনুষ্ঠান করতে পারে, দেশে ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং জলোচ্ছ্বাসের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা তুলে দেশে পাঠায়, প্রয়োজনে দেশ থেকে বড় কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজনকে এখানে নিয়ে আসে। হৈচৈ করে তার নির্বাচন হয় এবং বলা বাহুল্য নির্বাচনের আগে খানিকটা মন কষাকষি, দলাদলি, কাদা ছোঁড়াছুড়ি হয়। কেউ যেন মনে না করে, আমি বলছি আমরা বাঙালি বলেই দলাদলি করে কাদা ছোঁড়াছুড়ি করি এবং অন্যেরা করে না। সেটি সত্যি নয়, পৃথিবীর সব দেশের মানুষই করে। যারা সাম্প্রতিককালে আমেরিকার এক-আধটা নির্বাচন দেখেছে তারা জানে কাদা ছোঁড়াছুড়ি কাকে বলে!

আমার ধারণা, বাঙালি হিসেবে আমাদের একটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা তুলনামূলকভাবে কম এবং সেটি দল বেঁধে কাজ করার ব্যাপারে সব সময়েই খানিকটা ঝামেলা করে আসছে। বিষয়টি হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। যেহেতু আমাদের দেশে সত্যিকার অর্থে দীর্ঘ সময়ের জন্যে গণতন্ত্র কখনোই ছিল না, আমরা কখনোই এই পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হতে পারিনি। মনে হয় সে কারণেই আমরা তুলনামূলকভাবে অসহিষ্ণু এবং সময় বিশেষে খানিকটা ছেলেমানুষ। তবে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। যাদের মাঝে সহিষ্ণুতার চিহ্নমাত্র ছিল না আজকাল তারাও মুখ বুঁজে অনেক কিছু সহ্য করেন। গলাবাজী করে অনেকদূর যাওয়া যায় কিন্তু সংখ্যাধিক্যের জোরে গলাবাজদের দূর করে দেয়া এমন কোনো অসম্ভব কাজ নয়, সেটা অনেকেই বুঝতে শিখেছেন।

প্রবাসী বাঙালির একটা বৃহৎ অংশের সবচেয়ে বড় সমস্যা সম্ভবত নিজের দেশকে নিয়ে হীনম্মন্যতাবোধ। জন্মের পর থেকেই সবাই শুনে এসেছে যা কিছু ভালো তা হচ্ছে বিদেশের। শুধু যে ভোগবিলাসের সামগ্রী তা নয়, আজকাল দেখা যাচ্ছে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিও। বিজ্ঞানের কল্যাণে পৃথিবীটা অনেক ছোট হয়ে গেছে, এক দেশের শিল্প-সংস্কৃতি এখন অন্যদেশে অনায়াসে অনুপ্রবেশ করে ফেলে। তাতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু বিদেশের প্রচণ্ড মোহ যখন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে অতিক্রম করে যায় তখন একটা দুঃখজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়। হঠাৎ করে তারা নিজের দরিদ্র দেশের সাথে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশের তুলনা করতে থাকেন। পদে পদে তার দোষ চোখে পড়ে। তাই যখন দশজন বাঙালির সাথে একত্র হয়ে আড্ডা মারেন, রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন, রাজা-উজীর মারেন তখন তার সাথে আরো একটি জিনিস করেন।

দেশকে, দেশের মানুষকে গালি দেন।

সবাই দেন, সব সময় দেন সে রকম বলব না, কিন্তু যাঁরা এ দেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের একটা অংশ মোটামুটি নিয়মমাফিক দেশ এবং দেশের মানুষকে গালি দেন। আমি দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করে এসেছি, আমার পর্যবেক্ষণ ভুল হবার সম্ভাবনা কম। প্রবাসী বাঙালিদের দেশ

এবং দেশের মানুষকে নিয়ে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব রয়েছে। তাচ্ছিল্যটুকু হয়ত সহ্য করা যায় কিন্তু সেটা যখন হৃদয়হীনতার পর্যায়ে চলে যায়, সেটা সহ্য করা যায় না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

বাংলাদেশে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের পর স্থানীয় বাঙালিরা অনেক টাকাপয়সা তুলে দেশে পাঠিয়েছে। কোনো একটি সংগঠন চেষ্টা করছে একটা আশ্রয় শিবির তৈরি করতে, যেখানে ঘূর্ণিঝড়ের সময় এসে মানুষ নিজের প্রাণ বাঁচাতে পারবে। সেটা শুনে একজন বললেন, কেন খামাখা ওদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন? ওদের তো মরাই ভালো!

আমি বলছি না প্রবাসী সব বাঙালিই এরকম হৃদয়হীন কিংবা সবাই এটা বিশ্বাস করে। কিন্তু একজন তো এটা বিশ্বাস করে, সেই একজনই কেন তৈরি হল? কেমন করে তৈরি হল? বিদেশে পাকাপাকিভাবে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেবার পর ঠিক কোন জিনিসটা ঘটে যেটা একজন মানুষকে নিজের শৈশবের কৈশোরের দেশকে, দেশের অসহায় মানুষকে এরকম প্রচণ্ড ঘৃণা নিয়ে দেখতে শেখায়? আমি যার কথা বলছি তিনি তো শিক্ষা-সংস্কৃতিবিহীন জড়বুদ্ধির মানুষ নন। তিনি বাঙালির অনুষ্ঠানে গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা দেন, রবীঠাকুরের কবিতা পড়েন, বড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ. ডি. করে এসেছেন।

হতে পারে এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আমি প্রাণপণে তাই বিশ্বাস করার চেষ্টা করে আসছি। তার মাঝে হঠাৎ একটা ছোট ভূমিকম্প নিউজার্সী এলাকায় ঘরবাড়ি নাড়িয়ে গেল। বাঙালিরা একত্র হয়ে ভূমিকম্প নিয়ে গল্প করছেন, একজন বললেন, বড় ভূমিকম্প এসে বাংলাদেশের সব মানুষকে মেরে ফেলুক। তাহলে যদি দেশটা ঠিক হয়।

যিনি একথা বলছেন তিনি ধার্মিক মানুষ, শুধু যে নিজে ধর্মকর্ম করেন তাই নয়, এলাকার বাচ্চাদের খোদার মহিমা শেখানোর চেষ্টা করেন। পড়াশোনা করেছেন, একটা ডক্টরেট আছে, এলাকার সম্মানী ব্যক্তি, তাঁকে ছাড়া বাঙালিরা অনুষ্ঠান করে না। বিপদে-আপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। তিনি কেন দশজনের সামনে দেশের প্রতিটি মানুষের মৃত্যু কামনা করেন? দেশ থেকে বহুকাল আগে চলে এসেছেন, দেশ তাঁর কাছে কিছু আশা করে না, তিনিও দেশের কাছে কিছু আশা করেন না। তাহলে কি দেশের জন্যে খানিকটা অবহেলা, নিদেনপক্ষে খানিকটা তাচ্ছিল্যই যথেষ্ট ছিল না? কেন এই ভয়ঙ্কর উগ্র জিঘাংসা?

আরেকজনের কথা। দেশ থেকে ঘুরে এসে বলেছেন, দেশের নৈতিক অবস্থা এত নিচে নেমে গেছে যে দেশের নেতৃত্ব এখন আসতে হবে বিদেশ থেকে। কথাটি তাঁর নিজের নয়, দেশের কোনো একজন জ্ঞানী মানুষ নাকি বলেছেন। যিনি এরকম একটা কথা বলতে পারেন তাঁর জ্ঞানটুকুর উপর আমার সেরকম ভরসা নেই। নেতৃত্ব রঙিন টেলিভিশন নয় যে প্রয়োজনে বিদেশ থেকে আমদানি করা যায়। কিন্তু কথাটি দেশ থেকে টেনে এনে আমাকে শোনানোর ব্যাপারটা আমাকে একটু বিচলিত করেছে। দেশবাসীর মৃত্যু কামনার মতো ভয়ঙ্কর অভিশাপ এই কথাটিতে নেই কিন্তু একটা জাতির মৃত্যু ঘটে গেছে সেই উপলব্ধিটুকু আছে, সেটাও

বিস্ময়কর, অর্থবিত্ত ও নিরুপদ্রব জীবনের লোভে বিদেশে থেকে যাওয়ার একটি দার্শনিক ব্যাখ্যা– "দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের সময় এগিয়ে যাব" এরকম সূক্ষ্ম একটা ইঙ্গিত।

কিন্তু নিজেকে নিজে চোখে ধরে লাভ কি? "যে অর্থবিত্ত আর নিরুপদ্রব জীবন আমি আমার জন্য চাই সে জীবন আমার দেশ আমাকে দিতে পারবে না, আমি তাই দেশ ছেড়ে এসেছি–" এই সত্যি কথাটি বলতে সবার এত ভয় কেন? সবার ভিতরে কেন তাহলে একটা সূক্ষ্ম অপরাধবোধ?

পৃথিবীর সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলির একটি তার সাধ্যমতো চেষ্টা করে একেক জনকে শিক্ষিত করে তুলেছিল, সেই শিক্ষাকে পুঁজি করে সবাই এদেশে এসে অর্থবিত্ত আর নিরুপদ্রব জীবন ভোগ করছে, তাই হয়ত এই সূক্ষ্ম অপরাধবোধ– এটা থাকাই স্বাভাবিক। কে জানে হয়ত এটা থাকাই উচিত। পুঁজিবাদী দেশের মানুষের মতো একটা হিসাব করলে কেমন হয়? দেশ থেকে যে শিক্ষা নিয়ে সবাই এদেশে এসেছে, এদেশের বাজারে সেই শিক্ষার মূল্য কত? সুদে-আসলে এখন সেটা কত হয়েছে? দেশের সেই ঋণটা ডলারে হিসেব করে দেশকে ফেরৎ দিলে কি সূক্ষ্ম অপরাধবোধটা একটু কমবে?

কেউ কি চেষ্টা করে দেখেছে?

আমি একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি সাথে সাথে ঘুরে আমার দিকে তাকিয়ে উজ্জ্বল চোখে বললেন, অবশ্যি দেব। একশ'বার দেব। ভালো একটা আইডিয়া দিয়েছেন আপনি। সবাই মিলে একটা ট্রাস্ট খুলে–

বড় ভালো লাগল শুনে! প্রবাসী বাঙালি তাঁর দেশকে ভুলেননি। কেমন করে ভুলবেন? সেটা কি সম্ভব?